ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের

চতুর্থ শ্রেণীর (class IV.) জন্য পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

(Vide Calcutta Gazette 3rd Oct. 1923).

সাহিত্যসোপান

চতুর্থ ভাগ।

বোলপুর বিশ্বভারতীর কর্মসচিব

"প্রাকৃতিকী" "বৈজ্ঞানিকা" "গ্রহনক্ষত্র" "গাছপালা"

"পোকামাকড়"-প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর,

আশুতোষ লাইব্রেরী,

[illegible]।১, কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পাটুয়াটুলী—ঢাকা। অন্দরকিল্লা—চট্টগ্রাম।

১৩৩০

মূল্য ।/১০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

পরিশিষ্ট

বিশেষ সূচী।

জীবনচরিতমূলক গল্প।

(Biographical Tales.)

উদ্ভিদ, প্রাণী ও ঋতুপর্য্যায় সম্বন্ধে কথোপকথন।

(Dialogues about Plants, Animals and Seasons of the Year.)

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নৈসর্গিক ঘটনার বর্ণনা।

(Word Pictures of Natural Scenes and Phenomena.)

জেলা-বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি।
(District Boards and Municipalities.)

সমবায় ঋণদান-সমিতি।
(Co-operative Credit Societies.)

ডাকঘর-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।
(Postal Information.)

চিঠিপত্র এবং চিঠির পাঠ লেখার রীতি।
(Correspondence and How to Address it.)

বিবিধ পাঠ।
(Miscellaneous Lessons.)

ক্ষুদ্র সরল কবিতা।
(Short Easy Poems.)

পরিশিষ্ট।

সাহিত্যসোপান।

চতুর্থ ভাগ।

রাণা কুম্ভ।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে মেবার নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কুম্ভ সেই রাজ্যের রাণা অর্থাৎ রাজা ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে মেবার অল্প দিনের মধ্যে একটি প্রধান রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

মেবারের নিকটে গুজরাট ও মালব নামক আরও দুইটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজারা মেবারের সমৃদ্ধি দেখিয়া রাণা কুম্ভকে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন এবং শেষে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মেবার আক্রমণ করিলেন। কুম্ভ ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি একলক্ষ পদাতিক ও একহাজার হস্তী লইয়া বিপক্ষের

সম্মুখীন হইলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল। কিন্তু শত্রুসৈন্য কুম্ভের বিরুদ্ধে অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না। তাহাদের অনেকেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কেবল গুজরাটের অধিপতি মামুদ পলাইতে পারিলেন না। কুম্ভ তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজের রাজধানী চিতোরে আনয়ন করিলেন।

যাহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত তাহাদিগকে তখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার নিয়ম ছিল। রাণা কুম্ভ দয়া করিয়া মামুদকে প্রাণদণ্ড না দিয়া নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা শুনিয়া মামুদ কাতর হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা-প্রভৃতি পরিজন হইতে দূরে থাকার চেয়ে, মৃত্যুই ভাল।

রাণা কুম্ভ বন্দিশালা পরিদর্শন করিতে আসিলে মামুদ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"আমি পরাজিত এবং আপনার বন্দী। সুতরাং আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা দণ্ড প্রদান করিতে পারেন। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে যাহাতে আমার পরিজনদিগকে একবারমাত্র দেখিতে পারি, আপনি দয়া করিয়া তাহার আদেশ প্রদান করুন।"

রাণা কুম্ভ মামুদের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি অকারণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই আপনার প্রথম অপরাধ,—আপনাকে ক্ষমা করিলাম। এখন নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আপনি পুত্রকন্যাদিগের সহিত আনন্দে বাস করুন।"

রাণা কুম্ভের আদেশে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মামুদ মহাসমারোহে নিজের রাজধানীতে ফিরিলেন। তিনি সেদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও মেবাররাজ কুম্ভের সহিত শত্রুতা করিবেন না।

দণ্ড দিয়া সকল সময়ে শত্রুকে বশীভূত করা যায় না। ক্ষমা দ্বারাই শত্রু প্রকৃতরূপে বশীভূত হয়।

১। অনুশীলন—আরোহণ, আনন্দ, শত্রুতা, এই শব্দগুলির বিপরীত অর্থপ্রকাশক শব্দগুলি কি হইবে?

২। রাণা কুম্ভ মামুদকে কেন ক্ষমা করিলেন?

মহম্মদ মহসীন ও চোর।

তোমরা হয় ত সকলে মহম্মদ মহসীনের নাম শুন নাই। তিনি পরম ধার্ম্মিক এবং দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমানদিগের লেখাপড়ার জন্য, দরিদ্রের ভোজনাদির জন্য তিনি অনেক সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। হুগলির ইমামবাড়া, কলেজ, হাসপাতাল, ও মাদ্রাসা তাঁহারই কীর্ত্তি। মহসীনের দয়াসম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা তোমাদিগকে বলিব।

একদা রাত্রিতে মহম্মদ মহসীন ঘুমাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ঘরে এক চোর আসিল। মহসীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন!

চোর মহা বিপদে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; পলাইবার চেষ্টা করিল না। মহসীন বুঝিলেন, লোকটি পাকা চোর নয়। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন এই পাপের কাজ করিতে আসিলে? যে চুরি করে লোকে তাহাকে ঘৃণা করে ও অপমান করে, ইহা তুমি জান না কি?"

চোর উত্তর করিল,—"আমি অক্ষম। আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা অনাহারে আছে। দ্বারে দ্বারে ফিরিলাম, কেহ ভিক্ষা দিল না। ছেলেমেয়েদের জন্য এই পাপ কাজ করিতে আসিয়াছি।"

চোরের কথায় মহসীনের মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি

মহম্মদ মহসীন।

চোরকে সঙ্গে লইয়া আর একটি ঘরে গেলেন। সেই ঘরে তাঁহার সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্য রাখা হইত। রাশি রাশি টাকা ও সোনারূপার দ্রব্য সেই ঘরে সাজান ছিল। মহসীন চোরকে বলিলেন,—"দেখ, কত সোনারূপার দ্রব্য এবং কত টাকা এই ঘরে আছে। তুমি যাহা ইচ্ছা লইয়া যাও।"

চোর মনে করিল, মহসীন পরিহাস করিতেছেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"হুজুর আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। চুরি করিতে আসিয়া যে পাপ করিয়াছি,—তাহার শাস্তি জগদীশ্বরই দিবেন। আমাকে ছাড়িয়া দিন্।"

মহসীন সে কথায় কান দিলেন না। তিনি চোরের কাপড়ের একপ্রান্তে এক রাশি টাকা বাঁধিয়া দিলেন।

চোর এবারে ভয় পাইল। সে ভাবিল, মহসীন তাহাকে টাকা সমেত পুলিসের হাতে দিবেন। মহসীনের পা জড়াইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

চোরের কান্নাতে মহসীনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"তুমি চুরি করাকে যখন পাপ বলিয়া জানিয়াছ, তখন জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ভয় করিও না। তুমি এই টাকা বাড়ী লইয়া যাও। আর কখনও চুরি করিতে আসিও না।"

চোর আর অবিশ্বাস করিল না। সে মহসীনের দয়ার পরিচয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাঁহারি পা ধরিয়া বলিল, "আপনি দেবতা, আমি ঘোর পাপী। আপনি আমার

ছেলেমেয়েদের বাঁচাইলেন এবং আমাকেও পাপ হইতে রক্ষা করিলেন! আমি জীবনে আর পাপ কাজ করিব না।"

মহাত্মা মহসীনের কৃপায় চোর সেইদিন হইতে সাধু হইয়া গেল।

[অনুশীলন ঃ—পাপী—যে পাপ কার্য্য করে। উদয়—আবির্ভাব।

২। মহম্মদ মহসীনের সহিত চোরের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা নিজের ভাষায় বল।

৩। মহম্মদ মহসীন চোরকে ক্ষমা করিলেন কেন?

ফুল।

(কথোপকথন)

শিক্ষক।—আজ তোমাকে ফুলের বিষয় কিছু শিক্ষা দিব। ফুল আনিতে বলিয়াছিলাম, আনিয়াছ কি?

ছাত্র। গোলাপ, টগর, জুঁই, অতসী, কৃষ্ণচূড়া ও জবা ফুল আনিয়াছি।

শিক্ষক।—অনেক ফুল আনিয়াছ দেখিতেছি। আচ্ছা এই যে সাদা, হল্‌দে, লাল, নীল ইত্যাদি নানারঙ্গের ফুল গাছে গাছে ফুটে, এগুলিতে কি কাজ হয় বলিতে পার কি?

ছাত্র। ফুল দিয়া লোকে পূজা করে, মালা গাঁথে; আবার কোন কোন ফুল হইতে ফলও হয়।

শিক্ষক।—মানুষ ফুল দিয়া পূজা করিবে বা মালা গাঁথিবে, ইহার জন্য গাছে ফুল হয় না। ফল উৎপন্ন করিবার জন্যই গাছে গাছে ফুল ফুটে। ষাইট, সত্তর বা আশী বৎসরের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়। কেবল মানুষ নয়, কুকুর, শিয়াল, ঘোড়া, ছাগল, সাপ, ব্যাঙ্গ, পাখী সকলেই কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিয়া মারা যায়। গাছদের অবস্থাও তাই, তাহারাও মরে। মানুষ ও পশুপক্ষীদের যে সকল সন্তান জন্মে তাহারাই বংশ রক্ষা করে। মনে কর, আশী নব্বই বৎসর ধরিয়া কোন আমগাছে আম ফলিল না এবং বীজের অভাবে একটিও নূতন গাছ জন্মিল না। বুড়া আমগাছগুলি মরিয়া গেলে ইহাদের বংশ লোপ হইবে নাকি? তখন পৃথিবী খুঁজিয়া একটি আমগাছও দেখিতে পাইবে না।

ছাত্র। হাঁ বুঝিয়াছি,—ফল ও বীজ উৎপন্ন করিয়া বংশ রক্ষার জন্যই গাছেরা ফুল উৎপন্ন করে। মানুষের কোন প্রয়োজনের জন্য গাছে ফুল হয় না।

শিক্ষক।—ঠিক্ বুঝিয়াছ। ফল ও বীজই গাছের বিশেষ প্রয়োজনের দ্রব্য। এই কারণে যাহাতে উৎকৃষ্ট ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, ফুলেই তাহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এই যে জবা এবং গোলাপ ফুল তোমার নিকট আছে, সেগুলি পরীক্ষা কর। দেখ, এগুলিতে স্পষ্ট দুইটি করিয়া পৃথক থাক্ রহিয়াছে। ফুলের গোড়ায় রহিয়াছে, স্তবকাকারে সাজান সবুজ পাতার মত থাক্ এবং তাহারি উপরে আছে রঙ্গিন্ পাপ্‌ড়ির দল।

ছাত্র।—হাঁ, গোলাপ ও জবাফুলের থাক্ দেখিলাম।

শিক্ষক।—ফুলের সব তলাকার এই সবুজ পাতার মত অংশটির নাম কুণ্ড। ফুল যখন কুঁড়ির অবস্থায় থাকে, তখন

গোলাপ ফুল।

এই কুণ্ডই ভিতরকার কোমল পাপ্‌ড়িগুলিকে ঢাকিয়া রৌদ্র ও হিম হইতে রক্ষা করে। পরে ফুল ফুটিলেই তাহা ফুলের তলায় থাকিয়া যায় অথবা ঝরিয়া পড়ে।

ছাত্র।—ফুলের কোন্ অংশকে কুণ্ড বলে তাহা বুঝিলাম। ফুলের মাথায় রঙ্গিন্ পাপ্‌ড়ির কি কোন নাম নাই?

শিক্ষক।—আছে বই কি,—ইহাকে বলে পুষ্প-মুকুট। ফুলের মাথার রঙ্গিন্ দলগুলিকে মুকুটের মত দেখায় না কি? যাহা হউক, এপর্য্যন্ত তোমাকে ফুলের বাহিরের আবরণের কথাই বলিলাম। কুণ্ড ও পুষ্প-মুকুট ফুলকে বাহিরের উৎপাত হইতে

রক্ষা করে বলিয়াই ঐগুলিকে বহিরাবরণ বলে। কিন্তু ফুলের মধ্যস্থলের কেশরই ফুলের আসল জিনিষ।

ছাত্র।—ফুলের কেশর দেখিয়াছি। পেয়ারার ফুলে, পদ্মফুলে অনেক কেশর থাকে। জবা, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ সব ফুলেই কেশর আছে।

শিক্ষক।—হাঁ, সকল ফুলেই কেশর আছে। এই কৃষ্ণচূড়া ফুলটি পরীক্ষা কর; যে কয়েকটি লম্বা লাল কেশর ফুলের উপরে চক্রাকারে সাজানো দেখিতেছ, সেগুলিকে পুংকেশর বলা হয়।

ছাত্র।—হাঁ, লম্বা লম্বা পুংকেশরগুলি দেখিলাম।

শিক্ষক।—আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা কর, দেখিবে ঐ সকল কেশরের মাথায় এক একটা দানা জোড়া আছে। এই দানাগুলির নাম পরাগস্থালী। এগুলি যেন এক-একটি বাক্স। আমরা যাহাকে পরাগ বা ফুলের রেণু বলি তাহা এই সব পরাগ-স্থালীর ভিতরে থাকে। তুমি যদি আতসী কাচ দিয়া এগুলিকে পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে প্রত্যেক ফোটা ফুলের পরাগস্থালীর দুই পাশ যেন চিরিয়া গিয়াছে এবং ফাঁক দিয়া ভিতর হইতে ধূলার মত পরাগ বাহির হইতেছে।

ছাত্র।—হাঁ, ফুলের পরাগ অনেক দেখিয়াছি। কেয়াফুলে ধূলার মত অনেক পরাগ থাকে। নেবুর ফুলের পুংকেশরে হাত দিলে হাতে পরাগ লাগে।

শিক্ষক।—ঠিক বলিয়াছ। সকল ফুলেরই পরাগস্থালী

হইতে পরাগ বাহির হয়। এখন এই কৃষ্ণচূড়া ফুলটির ঠিক মাঝখানটি লক্ষ্য কর। দেখিতে অসুবিধা হইলে ইহার পাপ্‌ড়ি ও পুংকেশর ছিঁড়িয়া ফেল। দেখ, ফুলের ঠিক মাঝে
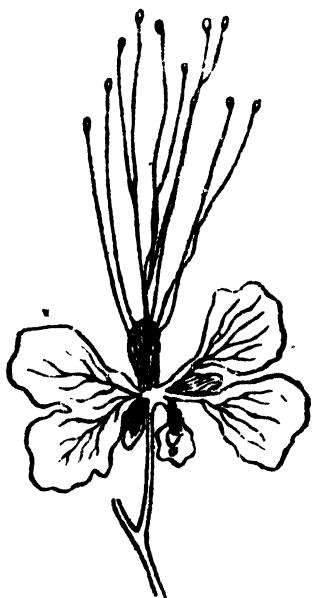
কৃষ্ণচূড়া ফুল।

সবুজরঙ্গের একটা লম্বা জিনিষ রহিয়াছে এবং তাহারই মাথায় একটি লম্বা শুঁয়া লাগান আছে। ইহার নাম গর্ভকেশর। কৃষ্ণচূড়া ফুলের পুংকেশর অনেক থাকে, কিন্তু গর্ভকেশর একটার অধিক দেখা যায় না। এখন দেখ, পুংকেশরের আগায় যেমন পরাগস্থালী আছে, গর্ভকেশরের আগায় তাহা নাই।

পরাগস্থালীর বদলে যেন আঠার মত একটা জিনিস আগায় লাগান আছে।

ছাত্র।—হাঁ, দেখিলাম,—নেবুর ফুলের গর্ভকেশরের মাথায় বেশী আঠা লাগান থাকে; একবার হাত দিলেই তাহা বুঝা যায়।

শিক্ষক।—এখন গর্ভকেশরের নীচেকার সবুজ জিনিষটা পরীক্ষা কর। যদি ছুরির ডগা বা আলপিন দিয়া চিরিয়া দেখিতে পার, তবে দেখিবে উহা নিরেট জিনিষ নয়,—ভিতরটায় ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে সবুজ রঙ্গের অনেক বীজ সাজান আছে। গর্ভকেশরের নীচেকার এই ফাঁপা জিনিষটার নাম বীজাধার এবং তাহার ভিতরকার ঐ ছোট বীজগুলিকে বলা হয় বীজাণু। এই বীজাধারই পরে ফল হইয়া দাঁড়ায় এবং বীজাণু-গুলি হইয়া পড়ে তাহার বীজ।

ছাত্র।—কেবল কৃষ্ণচূড়া ফুলেরই গর্ভকেশরের গোড়ায় কি এই রকম বীজাধার থাকে?

শিক্ষক।—না, অধিকাংশ ফুলেই তুমি ঐ রকম গর্ভ-কেশরের তলায় সুন্দর বীজাধার ও ভিতরে বীজাণু দেখা যায়। পেয়ারার ফুলেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাত্র।—আজ আপনার নিকট হইতে ফুল-সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিলাম।

শিক্ষক।—কিন্তু এখনও অনেক বলিতে বাকী রহিল।

কি প্রকারে ফুল হইতে ফল ধরে, তাহা তোমাকে আর এক দিন বলিব।

[দ্রষ্টব্য—শিক্ষক মহাশয় কতকগুলি সুপরিচিত ফুল লইয়া প্রত্যেক ফুলের কুণ্ড, মুকুট এবং কেশরাদি ছাত্রদিগকে দেখাইবেন। তাহার পরে অনুকূল ছাত্রদের হাতে দিয়া তাহার পূর্ব্বোক্ত অংশগুলি ছাত্রেরা দেখাইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিবেন।]

ফল।

(কথোপকথন)

ছাত্র।—আপনি সেদিন বলিয়াছিলেন কিপ্রকারে ফুল হইতে ফল ধরে, তাহা আমাকে বলিবেন। আজও আমি কতকগুলি ফুল আনিয়াছি। ফুল হইতে কিপ্রকারে ফল উৎপন্ন হয় তাহা বলুন।

শিক্ষক।—ফুলে ফল-ধরা আশ্চর্য্য ব্যাপার। তুমি হয় ত ভাবিতেছ, ফুল হইলেই তাহাতে ফল ধরে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় ফুলে ফল ধরে তাহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। পুংকেশরের পরাগ গর্ভকেশরের উপরে আসিয়া না ঠেকিলে কোন ফুলেই ফল ধরে না। তুমি যদি কোন আধ-ফোটা ফুলের কুঁড়ি হইতে পুংকেশরগুলি ছাঁটিয়া সেটিকে পাতলা কাগজের ঠোঙ্গা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পার, তবে দেখিবে, ফুল ফুটিতেছে, পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে ফুলে কখনই ফল ধরিতেছে

না। এখানে পুংকেশরের পরাগ, গর্ভকেশরের মাথায় লাগিতে পারে না বলিয়াই ইহা ঘটে।

ছাত্র।—আমি নিশ্চয়ই পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

শিক্ষক।—পুংকেশর এবং গর্ভকেশর অনেক ফুলেই একত্র থাকে। কিন্তু যাহাতে কেবল পুংকেশর বা কেবল গর্ভকেশর রহিয়াছে, এ রকম ফুলও অনেক আছে। কুমড়া, লাউ, তরমুজ, শশা, উচ্ছে, ধোঁধল প্রভৃতি গাছে ইহা দেখা যায়। ইহাদের কতকগুলি ফুলে কেবল পুংকেশর থাকে এবং আর কতকগুলি ফুলে কেবল গর্ভকেশরই থাকে। তুমি যে দুইটি কুমড়ার ফুল আনিয়াছ, তাহা পরীক্ষা কর। দেখ, এইটিতে কেবল

কুমড়ার পুরুষ-ফুল।

পুংকেশর আছে, গর্ভকেশর নাই। এই ফুলে সেইজন্য কখনই কুমড়া ধরে না।

ছাত্র।—হাঁ, আমাদের বাগানের কুমড়া গাছে এই রকম ফুল

প্রতিদিনই অনেক ফুটে, কিন্তু একটিতেও ফল ধরে না। তাই ফুল ছিঁড়িয়া আমরা ভাজিয়া খাই।

শিক্ষক।—কেন ফল ধরে না, বুঝিয়াছ কি ?

ছাত্র।—ইহাতে গর্ভকেশর থাকে না বলিয়াই ফল ধরে না।

শিক্ষক।—কুমড়ার যে অন্য একটি ফুল আনিয়াছ তাহা এখন পরীক্ষা কর; দেখ, ইহাতে কেবল গর্ভকেশরই আছে; পুংকেশর নাই। ফুলের তলায় যে মোটা অংশটা দেখিতেছ

কুমড়ার স্ত্রী-ফুল।

উহাই বীজাধার। এই বীজাধারই পরে কুমড়া হইয়া দাঁড়ায়। এই রকমের ফুলকে স্ত্রী-ফুল বলা হয় এবং যাহাতে কেবল পুংকেশরই থাকে, তাহাকে পুরুষ-ফুল নাম দেওয়া হয়।

ছাত্র।—কুমড়াগাছের স্ত্রী-ফুল, এবং পুরুষ-ফুল দেখিলাম।

আমাদের বাগানে যে লাউ, ঝিঙ্গে ও শশাগাছ আছে, তাহাদের স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুল আজই পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

শিক্ষক।—ফুল-সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে আজ বলিলাম। এগুলি মনে করিয়া রাখিও। এখন আর একটা কথা বলিয়াই আজিকার পাঠ শেষ করিব। একই গাছে যে কতক স্ত্রী-ফুল এবং কতক পুরুষ ফুল, হয়, তাহা বলিলাম। কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের একগাছে কেবল পুরুষ-ফুল এবং আর একগাছে কেবল স্ত্রী-ফুল হয়, ইহা তুমি দেখিয়াছ কি?

ছাত্র।—ইহা ত দেখি নাই।

শিক্ষক।—দেখিয়াছ, কিন্তু মনে পড়িতেছে না। পেঁপে গাছে তুমি ইহা দেখিতে পাইবে। বাড়ীর বাগানে অনেকগুলি পেঁপে গাছ পোঁতা হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েকটি গাছে কেবল লম্বা লম্বা ফুলই ধরিতে লাগিল এবং বাকি কয়েকটি গাছে পেঁপে ধরিল। ইহা দেখ নাই কি?

ছাত্র। হাঁ, দেখিয়াছি। আমাদের বাড়ীতে চারিটা পেঁপে গাছের মধ্যে একটাতে কেবল ফুলই ধরিত—ফল হইত না। তাই সেটিকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

শিক্ষক।—যাহাদের ফল হয় না, সেই পেঁপে গাছগুলি পুরুষ-গাছ। আর যাহাতে পেঁপে ধরে সেগুলি স্ত্রী-গাছ। পুরুষ-গাছে কেবল পুংকেশরযুক্ত ফুল ফুটে, তাহাতে গর্ভকেশরের চিহ্নমাত্র থাকে না। তাই এই সব গাছে ফল ধরে না। স্ত্রী-গাছে যে ফুল ধরে তাহাতে কেবল গর্ভকেশরই থাকে। তাই

এই সব গাছে যত ফুল ফুটে, তাহাদের প্রায় সবগুলি হইতেই পেঁপে হয়।

ছাত্র।—বড় আশ্চর্য্যের কথা। পেঁপের এক গাছে যে কেবল পুরুষ-ফুল এবং অন্য গাছে যে কেবল স্ত্রী-ফুল ফুটে তাহা আগে জানিতাম না।

শিক্ষক।—কেবল যে পেঁপেরই পুরুষ গাছ ও স্ত্রী-গাছ পৃথক্ আছে তাহা নয়। তাল, হ্যাঁতাল এবং পিটালি প্রভৃতি গাছদেরও পুরুষ-গাছ ও স্ত্রীগাছ পৃথক্ হয়। কোন কোন তালগাছে তাল ধরে না, কেবল লম্বা লম্বা জটার মত ফুল ধরে, ইহা তুমি দেখ নাই কি ?

ছাত্র।—হাঁ, দেখিয়াছি। আমাদের পুষ্করিণীর ধারেই এই রকম একটা তাল গাছ আছে। তাহাতে তাল ধরে না।

শিক্ষক।—উহাই পুরুষ-গাছ।

ছাত্র।—সবই বুঝিলাম। কিন্তু একটা কথা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বলিলেন, পুংকেশরের পরাগ গর্ভকেশরের আগায় না ঠেকিলে ফল ধরে না। স্ত্রী-ফুলের ত পুংকেশর থাকে না ; তবে স্ত্রী-ফুলের গর্ভকেশরে কোথা হইতে পরাগ আসে ?

শিক্ষক।—তোমার এই প্রশ্ন শুনিয়া খুসি হইলাম। স্ত্রী-ফুলের নিকটে যদি পুরুষ ফুল থাকে, তাহা হইলে নানা উপায়ে তাহার পরাগ স্ত্রী-ফুলে আসিয়া পড়ে। পরাগ কত লঘু জিনিষ তাহা দেখ নাই কি ? তাই একটু জোরে বাতাস বহিলেই সেগুলি

উড়িয়া নিকটের স্ত্রী-ফুলের উপরে আসিয়া পড়ে। তা' ছাড়া প্রজাপতি, মৌমাছি ও ভ্রমরেরা যখন মধু খাইবার জন্য ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহারাও এক ফুলের পরাগ পায়ে ও গায়ে মাখিয়া অন্য ফুলের গর্ভকেশরে লাগাইয়া আসে।

ছাত্র।—বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আজ আপনার নিকটে অনেক শিক্ষা করিলাম। উদ্ভিদ সম্বন্ধে অন্য কথাও অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একদিন বলিবেন।

[অনুশীলন ঃ—স্ত্রী-গাছ ও পুরুষ-গাছ কাহাকে বলে? প্রত্যেকের এক একটি উদাহরণ দাও।

২। যে সকল গাছে স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুল উভয়ই দেখা যায়, তাহাদের একটির নাম বল।].

আত্মত্যাগ।

পশু, পক্ষী ও ইতরপ্রাণীরা নিজেদের খাবার জোগাড় করিতে এবং নিজেদের শাবকদিগকে খাওয়াইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। যে সকল মানুষ কেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-দিগের সুখের জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা করে, তাহারা ইতরপ্রাণীর তুল্যই অধম। তাহারা কোনরূপেই প্রশংসার যোগ্য নহে। তাহারা এই সংসারে মনের আনন্দে থাকিতে পারে না। যাঁহারা স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসার পাত্র; তাঁহারাই যথার্থ মানুষ, বা মনুষ্যলোকে দেবতাতুল্য

কলিকাতার নিকটে ভবানীপুরের রাস্তায় দুই জন মজুর একদা মাটির নাচেকার নর্দ্দামা পরিষ্কার করিতেছিল। এই সকল নর্দ্দামায় সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে না, সেখানে দিনের বেলাতেও ভয়ানক অন্ধকার। তাহা ছাড়া অনেক জিনিষ পচিয়া সেখানকার বায়ুকে প্রায়ই বিষাক্ত করিয়া রাখে। ঐ দুই জন মজুর নর্দ্দামার ভিতরে কাজ করিতে করিতে সেখানকার বিষ-বায়ুতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

এই দুর্ঘটনায় শত শত লোক নর্দ্দামার নিকটে জমা হইল, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া তাহার নীচে নামিয়া সেই হতভাগ্য মজুর দুইটিকে উঠাইতে পারিল না। নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামে একটি যুবক সেই জনতায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রমজীবিদ্বয় মৃতপ্রায়

হইয়াছে দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গায়ের জামা খুলিয়া তিনি নর্দ্দামায় নামিলেন এবং সেই হতজ্ঞান শ্রমজীবীদিগকে একে একে উপরে উঠাইলেন। শ্রমজীবীরা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু নফরচন্দ্র বাঁচিলেন না। নর্দ্দামার বিষ-বায়ুতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে যখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নর্দ্দামা হইতে উঠান হইল, তখন দেখা গেল তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে।

আজ প্রায় তের বৎসর হইল নফরচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। পরের উপকার করিতে গিয়া নিজের প্রাণ দান করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকে আজও তাঁহার নাম ভুলে নাই। ভবানীপুরের যে স্থানটিতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছিল সেখানে একটি পাথরের স্তম্ভে নফরচন্দ্রের নাম লেখা আছে। যে দিন উহা স্থাপন করা হয়, সেদিন ছোটলাট বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নফরচন্দ্রের গুণ গান করিয়াছিলেন। পথের হাজার হাজার লোক পাথরের গায়ে নফরচন্দ্রের নাম পড়িয়া তাঁহার কীর্ত্তির কথা আজও প্রতিদিন স্মরণ করে।

[অনুশীলন ঃ—শ্রমজীবী—যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বিষবায়ু—যে বায়ুতে শ্বাস লইলে মৃত্যু ঘটে।

২। আত্মত্যাগ কাহাকে বলে? যিনি আত্মত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রকার অপর আর একটি ব্যক্তির নাম জানা থাকিলে তাহা বল।]

হিমালয়ের দৃশ্য।

ভারতবর্ষের উত্তরে যে পাঁচ শত ক্রোশ দীর্ঘ হিমালয়পর্ব্বত গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহার নানাস্থানের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবিদিগের লেখনী পরাজিত হইয়াছে। কোন সুনিপুণ চিত্রকরও সেই সকল দৃশ্যের অবিকল চিত্র এপর্য্যন্ত আঁকিতে পারেন নাই। কোথাও শ্যামল উপত্যকা- কোথাও অতি-শুভ্র তুষারক্ষেত্র, কোথাও স্বচ্ছতোয়া
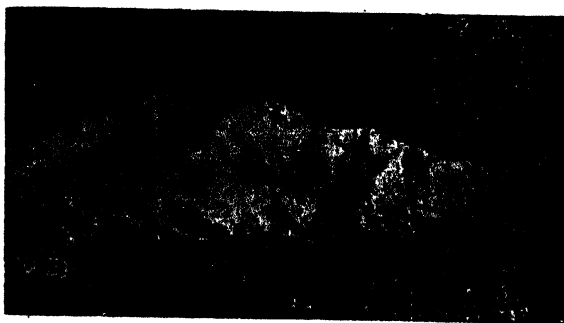
নির্ঝরিণীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া গিরিরাজ হিমালয় সর্ব্ব ঋতুতেই অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে।

গৌরীশঙ্কর নামক হিমালয়ের যে উচ্চ শিখর আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহার উচ্চতা প্রায় পাঁচ মাইল। ধবলগিরি ও কাঞ্চন-জঙ্ঘা শৃঙ্গদ্বয়ও উচ্চতায় অল্প নহে। হিমালয়ের এই শৃঙ্গত্রয়

শোভাসম্পদে, এবং উচ্চতায় পৃথিবীর সকল শিখরকে পরাজিত করিয়াছে। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু-প্রভৃতি নদনদা হিমালয়েই জন্মগ্রহণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্য ভূমিকে ধনধান্য-শালিনী করিয়াছে। এই সকল নদীর উৎপত্তিস্থানের শোভা দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়।

পৃথিবীর সর্ব্ব ঋতু এবং সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষী এই মহাপর্ব্বতে বর্ত্তমান। উত্তরমেরুর তুষারক্ষেত্রে যে সকল তৃণগুল্ম-প্রাণী দেখা যায়, হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছন্ন স্থানগুলিতে তাহা রহিয়াছে। আফ্রিকা এবং আমেরিকার গভীর অরণ্যে যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ্ আছে, হিমালয়ে তাহাদেরও অভাব নাই। ইহা দেখিলে মনে হয়, যেন গিরিরাজ পৃথিবীর সকল শোভা-সম্পদ্ নিজের ক্রোড়ে পুঞ্জীভূত করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন!

দারজিলিং, সিমলা, নাইনিতাল, মশৌরী-প্রভৃতি অশেষ-শোভা-সম্পন্ন নগরগুলি হিমালয়ের অঙ্কে অবস্থিত। দারজিলিংএর উচ্চতা সাত হাজার ফুট মাত্র। ইহারই নিকটে সিঞ্চল-নামক শৈলশিখরে দাঁড়াইলে হিমাচলের যে মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা অতি সুন্দর! চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালাকে এখান হইতে চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হয়। নীল মহাসমুদ্রের সফেন শুভ্র ঊর্ম্মিমালা একের উপরে আর একটি দাঁড়াইয়া যে শোভা বিস্তার করে, নিম্নের শ্যামল পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে শুভ্র পর্ব্বতশিখরগুলিতে সেই শোভাই দেখা যায়। বহুনিম্নে ত্রিস্রোতা ও মহানদী-প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর ধারাগুলি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। সেগুলিকে

দেখিলে মনে হয়, কে যেন হিমাচলের শ্যামকলেবরে কয়েকটি রজতসূত্র লম্বিত রাখিয়াছে। এই সকল নদীই হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া উত্তর-বঙ্গের সমভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়াছে।
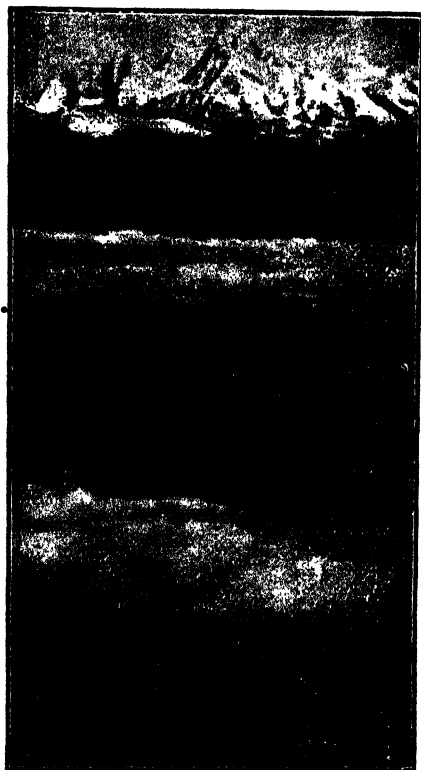
কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সিঞ্চল পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃক্ষের অভাব নাই।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই স্থানটি নানাজাতীয় তরু-গুল্ম-লতায় আচ্ছন্ন থাকে। তাহার পরে যখন প্রত্যেক তরু ও লতা বিচিত্র বর্ণের পুষ্পাভরণে ভূষিত হয়, তখন সেখানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। এখানকার ম্যাগ্‌নোসিয়া-নামক এক প্রকার বৃক্ষের শ্বেত ও লোহিত পুষ্প-স্তবকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্যে বনভূমি যেন উৎসবের বেশ ধারণ করে।

দারজিলিং হইতে নেপালের দিকে অগ্রসর হইয়া যতই উপরে উঠা যায় ততই মনোরম নূতন দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে একঘেয়ে ভাব একটুও নাই; ইহার সকলই নূতন এবং নয়নানন্দকর। কিন্তু পথ অতি দুর্গম; পথিক-দিগকে প্রায়ই গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া অতি কষ্টে চলিতে হয়। কোথাও বামের দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বত এবং দক্ষিণের অতি গভীর গহ্বরের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে পথ অবস্থিত। কোথাও বা খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম না করিলে আর উপরে উঠা যায় না। এই সকল স্থানের অধিকাংশ, পাইন ওক-প্রভৃতি বৃক্ষে এবং গভীর বেণুবনে আচ্ছন্ন। মুক্তস্থানের মাঝে মাঝে যে দুই একটি গ্রাম আছে সেগুলিরও দৃশ্য চমৎকার। প্রত্যেক গ্রামই ধান্য, ভুট্টা ও গোধূম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেষ্টিত। এগুলিকে দেখিলে মনে হয়, যেন কোন সুনিপুণ চিত্রশিল্পী পর্ব্বতগাত্রে এক একখানি চিত্রপট অঙ্কিত রাখিয়াছেন।

নেপাল রাজ্যের নিকটে টোঙ্গলো-নামক যে সাড়ে নয় হাজার ফুট উচ্চ শিখর আছে, তাহার উপরে দাঁড়াইলে হিমালয়ের আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। উত্তরে তুষারকিরীটিনী কাঞ্চনজঙ্ঘা সূর্য্যালোকমণ্ডিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। পূর্ব্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

এখানে পর্ব্বতে যে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখা যায়, তাহা হিমালয়ের অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হন, তখন পর্ব্বতমালার কটিদেশে যে সকল মেঘ স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে সেগুলি হঠাৎ লোহিত, পীত, পাটল-প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। তাহার পরে সূর্য্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বর্ণই একে একে নীল এবং হরিদাদি অনুজ্জ্বল বর্ণে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক এই রঙ্গের খেলা দেখাইতেছে।

হিমালয়ের যে অংশে কাশ্মীর-প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত, সেখানে গিরিরাজের আবার আর এক মূর্ত্তি দেখা যায়। সেই স্থান বৎসরের সকল সময়েই শ্যামল তরুলতায় আচ্ছন্ন থাকে। ধবলগিরি বা গৌরীশঙ্করের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মহান্ গম্ভীর দৃশ্য এ অঞ্চলে নাই সত্য, কিন্তু হরিপর্ব্বত-প্রভৃতির দৃশ্যও অতি সুন্দর। ঝিলম নদ খরস্রোতে এই স্থানে প্রবাহিত। নদীর দুই তীরই ফলপুষ্পের ভারে

অবনত বৃক্ষরাজিতে এবং শ্যামলক্ষেত্রে আবৃত। এই সকল দেখিলে মনে হয়, যেন প্রকৃতি-দেবী এই স্থানেই তাঁহার বিচিত্র আসনখানি পাতিয়া উপবিষ্টা আছেন। ঝিলম নদের উভয় তীরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর জম্মু অবস্থিত। নদের উপর সাতটি সেতু আছে। নগরবাসীরা সেই সকল সেতুর উপর দিয়া এক তীর হইতে অন্য তীরে গমনাগমন করে। কাশ্মীরের সকল দৃশ্যই মনোরম! এই জন্যই ইহা "ভূস্বর্গ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

[দ্রষ্টব্য ঃ—১। দুরারোহ—কষ্টে যাহার উপরে উঠিতে হয়। গিরিরাজ—পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২। দারজিলিং হইতে হিমালয়ের যে শোভা দেখা যায়, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণন কর।

৩। কাশ্মীরকে "ভূস্বর্গ" বলা হয় কেন?]

প্রাণী হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি মূল্যবান্ দ্রব্য।

(কথোপকথন)

সতীশ। বাবা, উট ত পশু—তাই নয় কি? তাদের ত চারিটি পা; গরুর মত বাচ্ছা হয়, কাকের বা শালিকের মত ডিম হয় না; আর তাদের ত পাখা নাই?

পিতা। হাঁ তাই বটে; সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সতীশ। বসন্ত ত কত বই পড়ে, সে অনেক কথা জানে; সে বলিতেছিল, একরূপ পক্ষীর নাম উট। তা কি সত্য, বাবা?

পিতা। উট পশুও বটে, আবার এক রকম পক্ষীকেও উট পাখী বলা হয়। পশু উট, আর পক্ষী উট এক প্রাণী নয়; উট পাখী দেখিতে কতকটা উটের মত বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এস তোমাকে উট পাখীর একটা ছবি দেখাইতেছি; দেখ উটের মত ইহাদের গলাটা লম্বা, পা তুইটি লম্বা লম্বা; পিঠটা ঠিক উটের মত না হইলেও কতকটা সেইরূপ। উটপাখীর পিঠেও চড়া যায়।

সতীশ। উটপাখী কোথায় পাওয়া যায়, বাবা?

পিতা। উটপাখী আফ্রিকা দেশের প্রাণী। কলিকাতার চিড়িয়াখানায় কয়েকটা উটপাখী আছে।

সতীশ। উট ত মানুষের কত উপকারে আসে। উটপাখী দিয়া কোনও উপকার হয় কি?

পিতা। না; উটপাখী উটের মত উপকারী জন্তু নয়। তবে উহার পালক বিলাতের মেয়েদের একটা বিলাসের

উটপাখী।

সামগ্রী। তাঁহারা উহা টুপিতে ব্যবহার করেন। এই জন্য উহা খুব মূল্যবান্। আফ্রিকাদেশে শিকারীরা পালকের লোভে তীরধনু দ্বারা উটপাখী শিকার করে।

সতীশ। আর কোনও প্রাণী হইতে ঐরূপ মূল্যবান্ বিলাসের সামগ্রী হয় কি ?

পিতা। অনেক প্রাণী হইতেই ত হয়। হাতীর দাঁত হইতে কত বহুমূল্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সতীশ। হাঁ, আমি হাতীর দাঁতের সুন্দর সুন্দর কৌটা, চিরুনি, দেবদেবীর মূর্ত্তি ইত্যাদি এবার মেলায় দেখিয়াছিলাম। বাবা, হাতীর দাঁত কত বড় হয় ?

পিতা। কখনও কখনও চারিহাত পর্য্যন্ত লম্বা এবং ছাব্বিশ সাতাইশ সের পর্য্যন্ত ভারি হয়।

সতীশ। ও রকম দাঁত ত আর কোনও জন্তুর নাই ?

পিতা। আছে ; সিন্ধুঘোটক নামে একপ্রকার জলজন্তু আছে, উহার দাঁতও বড় হয় ; এবং তদ্দ্বারা অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সতীশ। সে কথা যাক্, প্রাণী হইতে পাওয়া যায় এরূপ আর একটা বিলাসের সামগ্রীর নাম বলুন।

পিতা। মুক্তা ; মুক্তা দেখিয়াছ কি ? উহা কোথায় পাওয়া যায় জান কি

সতীশ। মুক্তা দেখিয়াছি ; দেখিতে সাদা ও গোল ; গহনাতে মুক্তা লাগান হয়। কিন্তু উহা কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায় তা ত জানি না। ও জিনিষটি কি, বাবা ?

পিতা। শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকের ভিতর মুক্তা পাওয়া যায় ; উহা কি, তাহা পরে বলিব। ডুবুরিরা সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়া ঝিনুক তোলে।

সতীশ। সমুদ্রে ডুব দিয়া ? কাহারা সমুদ্রে ডুব দেয় ?

পিতা। এক রকম শিক্ষিত ডুবুরি আছে, উহারা এক রকম মুখোস পরিয়া জাহাজ হইতে শিকলের সাহায্যে খুব শীঘ্র শীঘ্র সমুদ্রগর্ভে নামে ; পরে এক একটা ঝুড়িতে যতগুলি পারে শুক্তি সংগ্রহ করে। দম বন্ধ হইয়া আসিলে কিংবা কোনও বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে তাহারা তাহাদের শিকল দ্বারা সঙ্কেত করে। তখন জাহাজের লোকেরা কলে এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে টানিয়া উপরে তোলে।

সতীশ। ডুবুরিরা মুখোস পরে কেন ?

পিতা। যাহাতে মুখে ও চক্ষুতে জল ঢুকিতে না পারে সেইজন্য মুখোস পরিয়া যায়।

সতীশ। শুক্তির ভিতরে কি মুক্তা থাকে ?

পিতা। হাঁ ; কোনও কোনও শুক্তির ভিতরে মুক্তা পাওয়া যায়। মুক্তা যে কিরূপ-ভাবে জন্মে ঠিক বলা যায় না। খুব সম্ভব শুক্তির ভিতরে বালুকণা প্রবেশ করিলে মুক্তা জন্মে। শুক্তির শরীর হইতে একপ্রকার রস বাহির হইয়া বালুকণাকে ঢাকিয়া ফেলে। ক্রমে শুক্তির মধ্যে থাকিয়া উহাই মুক্তায় পরিণত হয়।

সতীশ। সমুদ্র হইতে শুক্তি তুলিয়া, উহা কাটিয়া উহার ভিতর হইতে মুক্তা বাহির করে বুঝি ?

পিতা। না ; শুক্তিগুলিকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে ঐগুলি মরিয়া যায়। তখন এক একটা শুক্তি ফাটিয়া

দুইখানা হয়, ইহা বোধ হয় দেখিয়াছ। সে যাহা হউক, শুক্তি ফাটিয়া গেলে উহার ভিতরে মুক্তা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। থাকিলে উহা ধুইয়া লওয়া হয়। পরে উহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে।

[অনুশীলন ঃ—কোন্ কোন্ প্রাণী হইতে বিলাসের পাওয়া যায় ?

২। কোন্ কোন্ প্রাণী হইতে আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিয়া বল।

৩। মুক্তা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা নিজের ভাষায় বল।]

ডাকঘর।

ডাকঘর কাহাকে বলে তাহা তোমরা সকলেই জান। তোমাদের সকলের বাড়ীতেই হয় ত মধ্যে মধ্যে ডাকে দুই একখানা চিঠি আসে। ডাক-হরকরা বা পিয়ন ঐ চিঠি আনিয়া দেয়। সে কোথায় ঐ চিঠি পায় তাহা জান কি? তোমরা বলিবে সে ডাকঘর হইতে ঐ চিঠি আনে। কিন্তু ডাকঘরেই বা চিঠি কিরূপে আসে?

যদি তোমাদের গ্রামে ডাকঘর থাকে, তাহা হইলে তোমরা দেখিয়া থাকিবে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটা লোক একটা বা দুইটা থলিয়াপূর্ণ কতকগুলি চিঠি লইয়া আসে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐরূপ একটা বা দুইটা থলিয়াপূর্ণ কতকগুলি চিঠি লইয়া যায়। সে ডাকঘরেরই লোক। সে যে ডাক-ঘরে ঐ থলিয়া লইয়া যায় তথায় আবার অন্য ডাকঘর হইতে লোক আসিয়া ঐরূপ চিঠি দিয়া যায় বা লইয়া যায়। এইরূপে ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় সকল ডাকঘরের মধ্যেই একটা সুন্দর যোগাযোগ থাকে। বহু দূরের পত্র রেলে ও ষ্টিমারে ডাকঘরে যাতায়াত করে।

ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষ যে, চিঠিপত্র এই ভাবে সরবরাহ করেন, ইহার ব্যয়নির্ব্বাহ কিরূপে হয় জান কি?

তোমরা একখানা পোষ্টকার্ড দুই পয়সা ও একখানা

লেপাফা এক আনা দিয়া ক্রয় কর। যাহাতে চিঠি পথে কোনও-ক্রমে হারাইয়া না যায়, তজ্জন্য দুই আনা ব্যয়ে উহা রেজেষ্ট্রারি করিয়া দিবারও ব্যবস্থা আছে। ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষ চিঠিপত্র-সম্বন্ধে সাধারণতঃই খুব সতর্ক। রেজেষ্ট্রারি করা হইলে তজ্জন্য তাঁহারা আরও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। ডাকঘর দিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা, ঔষধ এবং কাপড়চোপড় ইত্যাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিন্দাও পাঠান যায়, তাহার জন্যও একটা নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল দিতে হয়। এইরূপে পোষ্টকার্ড ইত্যাদির মূল্য, রেজেষ্ট্রারি করার ফিস্ এবং টাকা ও পুলিন্দা প্রেরণের মাশুল ইত্যাদির জন্য ডাকঘরে সকলের নিকট হইতে যে অর্থ যায় উহার দ্বারা ডাকঘরের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। দেখ, ডাকঘরের ব্যবস্থা কেমন সুন্দর। যে চিঠি দিল তাহাকে সেই চিঠি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইলে কতই না ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ডাকঘরের সাহায্যে ভারতের একস্থান হইতে অন্য যে কোনও স্থানে পোষ্টকার্ড লিখিলে দুই পয়সা ব্যয়েই চিঠি পাঠান যায়। লেপাফাতে লেখা চিঠির ওজন আড়াই তোলা হইলে এক আনায় যায়। ডাকঘর দিয়া টাকা পাঠানের নাম মনিঅর্ডার। মনি-অর্ডারের মাশুল প্রতি দশ টাকায় দুই আনা। পুলিন্দার মাশুল প্রতি ২০ তোলায় দুই আনা। চিঠির ন্যায় পুলিন্দাও অতিরিক্ত দুই আনায় রেজেষ্ট্রারি করা

যায়; ইহা ছাড়া পত্র ও পুলিন্দার মধ্য হইতে মূল্যবান্ কোনও দ্রব্য যাহাতে অপহৃত না হইতে পারে, তজ্জন্য ডাক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বীমা (ইনসিউর) করিয়া দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বীমা-করা দ্রব্য অপহৃত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ উহার মূল্য দিয়া থাকেন।

এই সকল ব্যবস্থা ছাড়া ডাকঘরে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে আরও একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র লোকে যাহাতে ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে। ঐ ব্যাঙ্কে একযোগে নিম্নপক্ষে চারি আনা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যায়। এইরূপে যে টাকা জমা হয়, সরকার বাহাদুর উহার জন্য প্রতিবৎসর শতকরা তিন টাকা হিসাবে সুদ দিয়া থাকেন। অভাব ঘটিলে সপ্তাহে একবার সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে ইচ্ছানুরূপ অর্থ উঠাইয়াও আনা যায়। সঞ্চয়ের অভ্যাস খুব ভাল; সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নিজের নিকট উদ্বৃত্ত অর্থ রাখিলে তাহা প্রায়ই খরচ হইয়া যায়। অনেকের আবার তাহা চুরি হইবারও আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ডাকঘরে জমা দিলে টাকা কোনরূপে নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই; বরং উহা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। আশা করি তোমরা যখন উপার্জ্জন করিতে শিখিবে, তখন সঞ্চয় করিবার কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। সঞ্চয় করিবার সুবিধা সরকার বাহাদুর তোমাদের হাতের কাছেই রাখিয়া দিয়াছেন।

[অনুশীলন ঃ—পত্রপ্রেরণ করা ছাড়া ডাকঘরে আর কি কি কার্য্য হয়?

২। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ইহা দ্বারা লোকের কি উপকার হইতেছে?

৩। তুমি যদি কোন মূল্যবান্ দ্রব্য ডাকঘর দ্বারা পাঠাইতে চাও, তবে কি প্রকারে তাহা পাঠাইবে?]

মিউনিসিপালিটি ও জেলা-বোর্ড।

তোমাদিগকে এই পাঠে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়-সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে।

তোমরা জান, ইংরেজ রাজাই এদেশের শাসনকর্ত্তা এবং আমরা তাঁহার প্রজা। কিন্তু ইহা বোধ হয় জান না, কোনও কোনও বিষয়ে ইংরেজরাজ আমাদের নিজের শাসনভার আমাদের নিজেদেরই হস্তে দিয়াছেন।

নগরশাসন ইহাদের মধ্যে একটি। নগরের পথঘাট-সংস্কার নগরমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, রাত্রিতে পথে পথে আলোক দানের ব্যবস্থা, আবর্জ্জনা, মল ইত্যাদি দূর করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল নির্ম্মাণ করা ইত্যাদি নগরের হিতকর কতকগুলি কার্য্য নগরবাসীরা আপনারাই করিয়া থাকে। কিরূপে করে তাহা জান কি? তাহারা আপনাদের মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। সরকার বাহাদুরও কয়েকটি লোক মনোনীত করেন। এই সকল

মনোনীত লোক ও নগরবাসীদের প্রতিনিধিগণ সভা করিয়া নগরের সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির করেন। ঐ সভার নাম মিউনিসিপালিটি, এবং উহার সভ্যগণের নাম মিউনিসিপাল কমিশনার বা মিউনিসিপালিটির মেম্বার বা সদস্য।

মিউনিসিপালিটির সদস্যগণ একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে সচরাচর চেয়ারম্যান বলা হয়। তিনি এবং তাঁহার একজন সহকারীই সমস্ত কার্য্য করেন। মিউনিসিপালিটির সদস্যগণ তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, মিউনিসিপালিটি নগরের কার্য্য সকল করিবার জন্য টাকা কোথায় পায়? মিউনিসিপালিটির সদস্যগণ মিলিত হইয়া নগরবাসিগণের নিকট হইতে তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ-অনুসারে একটা কর আদায় করেন; ঐ কর হইতেই নগরের সমস্ত কার্য্য হয়।

নগরের ন্যায় কোনও কোনও বিষয়ে জেলার শাসনকার্য্যও ইংরেজরাজ জেলাবাসীদিগের হস্তে দিয়াছেন। জেলার মধ্যে পথঘাট-নির্ম্মাণ, কূপপুষ্করিণীর খনন, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন ইত্যাদি নগরবাসিগণের ন্যায় জেলাবাসিগণ নিজেদের প্রতিনিধিগণ দ্বারা করিয়া থাকে। ঐ প্রতিনিধিগণের সভার নাম জেলা-বোর্ড। জেলা-বোর্ডের কতকটি সদস্য সরকার বাহাদুর নিয়োগ করেন। জেলা-বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় আবার লোকালবোর্ড আছে। লোকাল বোর্ড মহকুমার কার্য্য করিয়া থাকেন।

তোমরা গ্রামে গ্রামে যে সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের কথা শুনিতে পাও, ঐ সকল বিদ্যালয়ের সাহায্য জেলা-বোর্ডই দিয়া থাকেন।

মিউনিসিপালিটির ন্যায় জেলা-বোর্ড কোনও কর আদায় করেন না। সরকার বাহাদুরই তাহাদিগের প্রত্যেককে নানা কার্য্যের জন্য অর্থ দিয়া থাকেন। জেলা-বোর্ড উহারই অংশ লোকাল বোর্ডকে দেন।

[দ্রষ্টব্য—মিউনিসিপালিটি ও জেলা-বোর্ডের কার্য্যের যে পার্থক্য আছে, শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

২। মিউনিসিপালিটী হইতে সাধারণতঃ কি প্রকারে কর ধার্য্য হয়? মিউনিসিপালিটির ও জেলা-বোর্ডের সভ্যগণ কি প্রকারে নিযুক্ত হয়েন?]

ঋতুর পরিবর্ত্তন।

(কথোপকথন)

শিক্ষক। ইন্দু, কি রকমে দিন রাত্রি হয়, তোমাকে সেদিন বুঝাইয়াছি। তাহা মনে আছে ত ?

ইন্দু। হাঁ, মনে আছে। আপনি সেদিন টেবিলের মাঝে প্রদীপ জ্বালিয়া এবং তাহার চারিদিকে একটা লাট্টু ঘুরাইয়া দিন-রাত্রি কি রকমে হয় বুঝাইয়াছিলেন। আমি তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছি।

শিক্ষক। কি বুঝিয়াছ, ছবি আঁকিয়া আমাকে বল।

ইন্দু। ছবি আঁকাই আছে। * এই দেখুন, ছবির প্রদীপ যেন সূর্য্য এবং লাট্টুটি যেন পৃথিবী। এই প্রদীপের মতই স্থির থাকিয়া সূর্য্য চারিদিকে আলোক ছড়াইতেছে এবং পৃথিবী তাহার নদ নদী পাহাড়-পর্ব্বত লইয়া এই লাট্টুর মতই বন্ বন্ করিয়া নিজে ঘুরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ছবি দেখিলেই বুঝা যায়, লাট্টুর যে অর্দ্ধেক প্রদীপের আলোর দিকে থাকে, কেবল তাহাতেই আলোক পড়ে এবং তাহার পিছনের দিক্‌টা অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে। কিন্তু লাট্টু স্থির নাই, এইজন্য উহার যে আধখানায় এখন আলোক পড়ে, পরক্ষণে তাহাই পিছনে গিয়া অন্ধকারে ডুবিয়া যায় এবং যাহা পিছনের অন্ধকারে ছিল তাহা প্রদীপের সম্মুখে আসিয়া আলোকিত হয়। পৃথিবী সূর্য্যের সম্মুখে এই লাট্টুর মতই ঘুরে, তাই তাহারও এক

---

* পরপৃষ্ঠায় ছবি দেখ।

অংশ যখন আলোক পায়, তখন আর এক অংশ অন্ধকারে থাকে। এই প্রকারে আলোকে থাকার সময়কে দিন এবং অন্ধকারে থাকার সময়কে রাত্রি বলে। লাট্টুর মত পৃথিবী
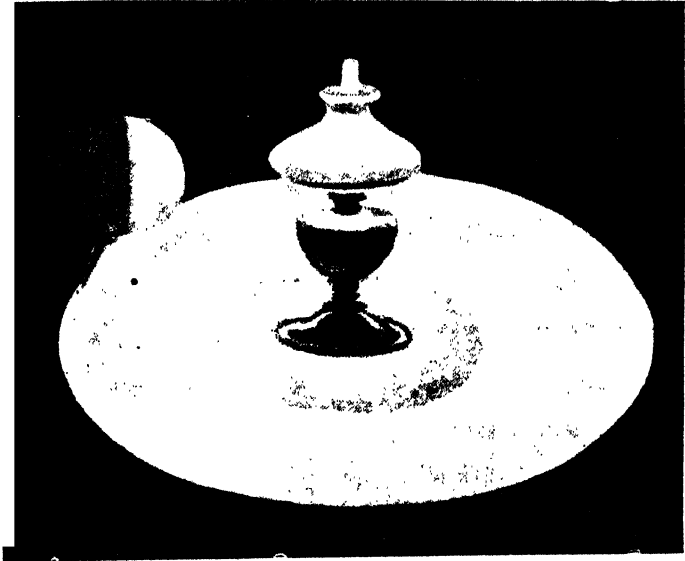
প্রদীপ ও লাট্টু।

ঘুরপাক্ দেয় বলিয়াই পৃথিবীতে চিরকাল ধরিয়া দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন আসে। লাট্টু এক মিনিটে শত শত বার ঘুরপাক্ দেয় কিন্তু পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্র আবর্ত্তন করে। এই জন্য পৃথিবীর দিন রাত্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা।

শিক্ষক। পৃথিবীতে রাত্রি ও দিন কিপ্রকারে হয়, তুমি ঠিক্ বুঝিয়াছ। এখন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয়টি ঋতু কি প্রকারে হয় এবং গ্রীষ্মকালে কেন দিন বড় রাত্রি ছোট হয় এবং শীতকালেই বা কেন রাত্রি বড় ও দিন ছোট হয়, সেই সকল কথা আজ তোমাকে বুঝাইব।

ইন্দু। ঋতুর পরিবর্ত্তন কেন হয় জানিবার জন্য অনেক দিন হইতে ইচ্ছা করিতেছি। আজ তাহা হইলে ঐ বিষয়টাই বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, চল ঘরের ভিতরে যাই। সেখানে প্রদীপ, লাট্টু এবং ভূ-গোলক দিয়া কেন ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তোমাকে বুঝাইব।

ইন্দু। (ঘরে গিয়া) এই যে প্রদীপ জ্বলিতেছে; ফুটবল গোলক, লাট্টু সকলই আছে।

শিক্ষক। টেবিলের উপর যে প্রদীপ জ্বলিতেছে মনে কর ইহাই যেন সূর্য্য; আর তাহার একটু দূরে ঐ যে লাট্টু, তাহার হুলের উপর দাঁড়াইয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে, উহা যেন আমাদের পৃথিবী।* লাট্টুটি তাহার হুলের উপরে ঠিক সোজা থাকিয়া ঘুরিতেছে কি?

ইন্দু। না, সোজা হইয়া ঘুরিতেছে না; এখন লাট্টুটি ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরিতেছে।

---

* পূর্ব্বের চিত্র দেখ।

শিক্ষক। লাট্টু যেমন ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরিতেছে, আমাদের পৃথিবীও ঠিক ঐ রকমে তাহার মেরুদণ্ডকে বাঁকাইয়া ঘুরপাক্
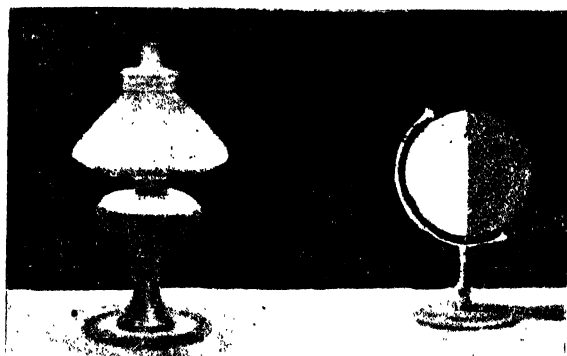
উত্তর-মেরুতে দিন।

দেয় এবং ঘুরপাক্ দিতে দিতে এই টেবিলখানার মত প্রায় গোলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ঘুরিবার সময়ে পৃথিবীর মেরুদণ্ড বাঁকা থাকে বলিয়াই দিন ও রাত্রির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তাহা ছাড়া পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুতে যে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি থাকে শুনিয়াছ, তাহাও পৃথিবী মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া ঘুরে বলিয়া হয়।

ইন্দু। আচ্ছা, পৃথিবীর মেরুদণ্ড কতটা বাঁকা থাকে?

শিক্ষক। এই ভূ-গোলকটা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। দেখ, গোলকটা প্রদীপের পার্শ্বে রাখিয়াছি। মনে কর, প্রদীপ

যেন সূর্য্য এবং গোলকটি যেন পৃথিবী। ইহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া প্রদীপের দিকে ঝুঁকিয়া আছে; তাই প্রদীপের আলোক গোলকের উত্তর-মেরুর উপরকার অনেকটা জায়গা আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। এখন যদি তুমি গোলকটিকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরাইতে থাক, তাহা হইলে উহার উত্তর-মেরু কখনই অন্ধকারে প্রবেশ করিবে না। পৃথিবী যখন এই রকম অবস্থায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যের সম্মুখে ঘুরপাক্ দেয়, তখন তাহার উত্তর-মেরুতে কেবল সূর্য্যের আলোকই পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় উত্তর-মেরুতে বহুকাল ধরিয়া দিন থাকে।

ইন্দু। হাঁ, এখন বুঝিলাম, কেন উত্তর-মেরুতে মাসের পর মাস দিনই থাকে।

শিক্ষক। এখন গোলকের নিম্নের দিকে লক্ষ্য কর। নীচের দিক্‌টাই দক্ষিণ-মেরু। দক্ষিণ-মেরুতে আলোক পড়িতেছে কি?

ইন্দু। না, উহা অন্ধকারেই আছে।

শিক্ষক। তাহা হইলে দেখ, যখন উত্তর-মেরুতে দিন হয়, তখন দক্ষিণ-মেরুতে রাত্রি আসে। দক্ষিণ-মেরুর রাত্রি উত্তর-মেরুর দিনের মতই দীর্ঘ। এখন, গোলকটিকে আবার ভাল করিয়া লক্ষ্য কর, দেখ, পৃথিবীর উত্তরদিকের আধ্‌খানার যতটা অংশে আলো পড়িতেছে, দক্ষিণের আধ্‌খানার তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প স্থানই আলোকিত হইতেছে। এই জন্যই এ অবস্থায় পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে দিন বড় হয় এবং দক্ষিণার্দ্ধে দিন ছোট হয়।

অর্থাৎ উত্তরার্দ্ধে যখন গ্রীষ্মকাল হয়, দক্ষিণার্দ্ধে তখন শীতকাল আসে।

ইন্দু। বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার!

শিক্ষক। হাঁ, খুব আশ্চর্য্যের কথাই বটে। পৃথিবীর দুই বিপরীত অংশে বিপরীত ঋতু দেখা যায়।

ইন্দু। দিন বড় হইলে কেন গ্রীষ্মকাল হয় এবং দিন ছোট হইলেই বা কেন শীতকাল আসে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষক। ইহা অতি সহজ কথা। দিন বড় হইলে অনেক ক্ষণ সূর্য্যের তাপ পাইয়া পৃথিবীর মাটি, পাথর ও জল ভয়ানক গরম হয়। কাজেই ছোট রাত্রিতে পৃথিবী সেই তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না। এই কারণে ঐ সময়ে দিনের পর দিন পৃথিবীর সকল জিনিষই গরম থাকিয়া যায়। ইহাই গ্রীষ্মকাল। যখন দিন ছোট থাকে, তখন পৃথিবীর মাটি, পাথর, সমুদ্র একটু গরম হইতে না হইতেই রাত্রি আসে এবং তাহার পরে দীর্ঘ রাত্রিতে সকল জিনিষই তাপ ছাড়িয়া ভয়ানক ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। তাই এই সময়টাকে আমরা শীতকাল বলি।

ইন্দু। হাঁ, এখন বুঝিলাম দিন ছোট হয় বলিয়া শীতকাল এবং দিন বড় হয় বলিয়া গ্রীষ্মকাল হয়।

শিক্ষক। প্রদীপের সম্মুখে গোলকটি বামে ছিল, এখন আমি ইহাকে সরাইয়া ঠিক দক্ষিণে রাখিলাম। ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার পরে পৃথিবী ঠিক্ এই রকমেই তাহার

ভ্রমণপথের বাম হইতে দক্ষিণে আসে। এখন তুমি গোলকে কি দেখিতেছ বল।

ইন্দু। এখন দক্ষিণ মেরুতে আলোক পড়িতেছে, উত্তর-মেরু অন্ধকারে ঢাকা আছে।

শিক্ষক। তাহা হইলে দেখ, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন এই অবস্থায় আসে, তখন উত্তর-মেরুতে দিন হয়
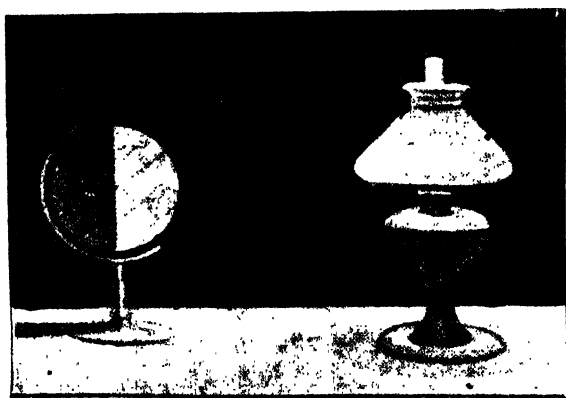
উত্তর-মেরুতে রাত্রি।

না, সেখানে বহুকাল ধরিয়া কেবল রাত্রিই বিরাজ করিতে থাকে। তাহা ছাড়া এই সময়ে পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের অনেক অংশই অন্ধকারে ঢাকা থাকে। তাই পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে এই সময়ে শীতকাল দেখা যায়।

ইন্দু। হাঁ, কি প্রকারে শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল হয়, তাহা

বুঝিলাম। এখন বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত ঋতু কিরূপে হয় বলুন।

শিক্ষক। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসকে শরৎ এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসকে হেমন্ত বলে। শরৎ ও হেমন্ত-কালে দিনগুলি ছোট থাকে, কি বড় থাকে তাহা তুমি বলিতে পার কি?

ইন্দু। ঐ দুই ঋতুতে একটু একটু করিয়া দিনগুলি ছোটই হইতে থাকে এবং ঠাণ্ডা বোধ হয়।

শিক্ষক। তাহা হইলে এখন বুঝিবে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পৃথিবী গ্রীষ্মের স্থান ছাড়িয়া শীতের স্থানের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় বলিয়াই এই সময়ে দিন ছোট হইতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে অল্প অল্প শীত বোধ হয়।

ইন্দু। হাঁ ঠিক বুঝিয়াছি। উত্তর-মেরুর সকল অংশই এই সময়ে আলোকিত থাকে না। একটু একটু করিয়া তাহা অন্ধকারে ঢাকা পড়িতে আরম্ভ হয়।

শিক্ষক। ইহা যখন বুঝিলে, তখন বসন্ত-ঋতু কি প্রকারে হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্তকাল। এই সময়ে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শীতের স্থান ছাড়িয়া গ্রীষ্মের স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাই তখনকার দিনগুলি একটু একটু করিয়া বড় হয় এবং ইহাতে শীতের প্রকোপ কমিয়া আসে।

ইন্দু। গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত-ঋতু কিপ্রকারে হয় বুঝিলাম। কিন্তু বর্ষা-ঋতুর কথা আপনি আমাকে এখনও

কিছুই বলেন নাই। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কেন এত বৃষ্টি হয় বলুন।

শিক্ষক। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে রাত্রির তুলনায় দিন বড় থাকে বলিয়াই আমাদের দেশে সে সময়ে বৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আছে। আষাঢ় ও শ্রাবণের দীর্ঘ দিনে বঙ্গদেশের স্থলভাগ যখন অত্যন্ত গরম হইয়া পড়ে, তখন তাহার উপরকার বায়ুও গরম ও লঘু হইয়া আকাশের উপরে উঠিতে থাকে। কাজেই এই সময়ে বঙ্গোপসাগর হইতে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য স্থলের দিকে ছুটিয়া আসে। এই বায়ুই যখন চিরাপুঞ্জী পাহাড়ে ও হিমালয়ে বাধা পাইয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে বঙ্গদেশের উপর দিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহারই জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া প্রচুর বৃষ্টি উৎপন্ন করিতে থাকে। তাহা হইলে দেখ, রাত্রির চেয়ে দিন বড় থাকে বলিয়াই আমাদের দেশে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়।

[দ্রষ্টব্য—শিক্ষক মহাশয় একটি ভূ-গোলক বা একটি ফুটবলকে প্রদীপের সম্মুখে রাখিয়া সূর্য্যের তাপ ও আলোক কি প্রকারে পৃথিবীর উপরে পড়ে, তাহা ছাত্রদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

২। দিনরাত্রি হ্রাসবৃদ্ধির জন্যই যে ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, ইহা প্রত্যেক ছাত্রকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণগুলি কেবল কণ্ঠস্থ করিলে ছাত্রেরা কিছুই শিক্ষা করিবে না।]

সমবায় ঋণদান-সমিতি।

(কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটি)

কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের গ্রামে ও নগরে যে সকল সমবায় ঋণদান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে যে দরিদ্র কৃষিজীবীদের কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

গ্রামের বহুলোক মিলিয়া এই ঋণদান-সমিতি গঠন করেন। ঋণ দিতে গেলেই টাকার প্রয়োজন, তাই গ্রামের লোকেরা একত্র হইয়া স্থির করেন যে, প্রত্যেকে দশ টাকা বা পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়া একটি তহবিল করিবেন। এই নির্দ্দিষ্ট চাঁদার টাকাকে "সেয়ার" অর্থাৎ অংশ বলা হয় এবং যাঁহারা চাঁদা দেন তাঁহাদিগকে সভ্য বলা হয়। যে সকল সভ্য অর্থশালী তাঁহারা একটার বেশি অংশ লইতে পারেন;—কিন্তু অধিক অংশ গ্রহণ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। কারণ সমিতিতে একজন লোকের অধিক অংশ থাকিলেই সেই ব্যক্তিই প্রবল হইয়া উঠে;এবং যাহাতে বেশি লাভ হয় সেই দিকেই তাহার দৃষ্টি পড়ে। লাভ করা ঋণদান-সমিতির উদ্দেশ্য নয়। ক্ষতি স্বীকার না করিয়া দশ জনে মিলিয়া দরিদ্র কৃষক প্রভৃতির সাহায্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

যে স্থানে সমিতি স্থাপিত হয়, সেই গ্রাম বা সেই নগরের

অধিবাসী ব্যতীত অন্য কেহ সভ্য হইতে পারে না। সভ্যদিগের বয়স আঠার বৎসরের অধিক হওয়া প্রয়োজন। তথাপি বৃহৎ গ্রামের সমিতিতে প্রায়ই তিন বা চারিশত করিয়া সভ্য থাকেন। প্রত্যেক বিষয়ে এত লোকের পরামর্শ লইয়া কাজ চালান যায় না। এই কারণে সভ্যেরা আপনাদেরই মধ্য হইতে অন্ততঃ পাঁচজন উপযুক্ত লোককে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের উপরেই সমিতির কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন। ইঁহাদিগকে সমিতির ডিরেক্টর বা পঞ্চায়েৎ বলা হয়। পঞ্চায়েৎরা আবার নিজেদের মধ্য হইতে এক জনকে সম্পাদক এবং আর একজনকে সভাপতি করেন। সম্পাদক মহাশয় সমিতির কার্য্য বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন।

সমিতি গঠিত হইলেই তাহাকে আইন-অনুসারে রেজেষ্ট্রারি করিয়া লইতে হয়। ছয় মাস অন্তর গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়-পরীক্ষকগণ আসিয়া সমিতির হিসাব পত্র পরীক্ষা করেন। ইহা ছাড়া পঞ্চায়েৎগণ প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার একত্র হইয়া সমিতি-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। কাজেই সমিতির কর্ম্ম সুশৃঙ্খলায চলে।

আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকদিগের অবস্থা ভাল নয়। কৃষিকার্য্য করিতে গেলে হালের বলদ ক্রয় করিতে হয়, সার কিনিতে হয়, আবার কখনও কখনও বেতনভোগী মজুর রাখিয়া জমি আবাদ করিতে হয়। এইগুলি ছাড়া সংসারের খরচ এবং পুত্র কন্যার বিবাহাদির ব্যয়ও আছে। কাজেই মহাজনের

নিকট হইতে তাহাদিগকে প্রায়ই ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। মহাজনেরা প্রায়ই ভাল লোক নহে। কেহ কেহ অনেক বিবেচনা করিয়া জমিজমা, এমন কি বাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া উচ্চ সুদে কৃষকদিগকে টাকা টাকা ধার দেন। কোন কোন মহাজন আবার এমন নিষ্ঠুর যে, সম্পত্তি বন্ধক রাখা সত্ত্বেও প্রতি টাকায় মাসে দুই পয়সা, কেহ কেহ আবার চারি পয়সা করিয়া সুদ আদায় করিতে থাকে। কাজেই কৃষকেরা চাষে যাহা পায়, তাহার প্রায় সকলই মহাজনের প্রাপ্য সুদ মিটাইতে খরচ করিয়া ফেলে; আসল টাকা শোধ যায় না। শেষে ঐ ঋণের দায়েই তাহাদের জমিজমা এবং গৃহাদি বিক্রীত হইয়া যায়। ঋণদান-সমিতি এখন অল্প সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দিতেছেন। ইহাতে যে কৃষকদিগের কত উপকার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

সুদ আদায় হইলে যে টাকা সমিতির তহবিলে সংগৃহীত হয়, তাহার সকলই সভ্যদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় না। ইহার শতকরা পঁচিশ টাকা পৃথক্ রাখা হয়। ইহাকে "রিজার্ভ ফণ্ড" অর্থাৎ গচ্ছিত তহবিল বলা হয়। যদি কোন কারণে কখন সমিতির ক্ষতি হয়, তখন ঐ টাকা দিয়া ক্ষতি পূরণ করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ প্রকারে টাকা কাটিয়া রাখার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যাঁহারা যেমন অংশ লইয়াছেন অনুসারে সভ্যদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কোন সভ্যকেই বৎসরে শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট

হারের অধিক লাভ দেওয়া হয় না। লাভ দেওয়ার পরেও যদি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা সমিতির তহবিলে জমা রাখা হয়।

সভ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও সমিতি হইতে ঋণ দেওয়া হয় না। যাঁহাকে ধার দেওয়া হইল, তিনি যাহাতে টাকার সদ্ব্যবহার করেন, তাহার প্রতি সকল সভ্যেরই দৃষ্টি থাকে।

যাঁহারা সমিতির সভ্য নহেন এ প্রকার অনেক লোক অল্প সুদ লইয়া সমিতিতে টাকা গচ্ছিত রাখেন। ইহা ব্যতীত প্রয়োজন হইলে সমিতি অপর স্থান হইতে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লইতেও পারেন। এই কারণে কোন ঋণদান-সমিতিতে অর্থাভাব ঘটে না।

আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রামে সমবায় ঋণদান-সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

[অনুশীলন ঃ—ঋণদান-সমিতি কৃষকদিগের কি উপকার করিতেছে? সাধারণ কৃষকদিগের অবস্থা কি প্রকার? নিজের ভাষায় বল।

২। কেবল গ্রামের লোকদিগকেই সমিতির সভ্য করার উদ্দেশ্য কি?

৩। সমবায়-প্রণালীতে আজকাল নানাস্থানে যে সকল দোকান হইতেছে এবং অন্যান্য ব্যবসায় চলিতেছে, তাহাদের কথাও শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।]

ক্রাকাতোয়ার ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত।

সুমাত্রা, জাভা, বর্ণিয়ো-প্রভৃতি দ্বীপে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে ঐ অঞ্চলে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। কম্পনের বেগে ভূতল বিদীর্ণ হইয়া জল ও কর্দ্দম উত্থিত হইতে লাগিল এবং ভূগর্ভ হইতে কামান গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দ শুনা গেল। অনেক বৃহৎ অট্টালিকা ভূশায়ী হইলে লোকে বুঝিল, এই ভূকম্পন সামান্য নয়।

ভূমিকম্পের পরের দৃশ্য।

সমস্ত রাত্রি কম্পন চলিল। পরদিন প্রাতে তারযোগে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ক্রাকাতোয়া নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে একটি

নূতন আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সংবাদে জাভার রাজকর্ম্মচারিগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। একখানি জাহাজ লইয়া তাহারা ক্রাকাতোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহাজ যখন দ্বীপ হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে পৌঁছিল, তখন দ্বীপের উপরে স্তম্ভাকারে ধূমরাশি দেখা গেল। দূর হইতে মনে হইল এই ধূমরাশি বুঝি সামান্য, কিন্তু জাহাজ নিকটে আসিলে জানা গেল, তাহা দেড় মাইল পরিধিবিশিষ্ট ধূমে ও বাষ্পে মিশ্রিত এক বিরাট অগ্নিস্তম্ভ! তাহার অগ্নি ও ধূমাদি ভীমবেগে আকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে তাহার ইয়ত্তা হইল না। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই মেঘগর্জ্জনের ধ্বনি! রাত্রিশেষে সেই ধ্বনিই শত শত কামান গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

প্রভাত হইল। সূর্য্যালোকে ক্রাকাতোয়ার উপকূলের কয়েকটি স্থান উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইল। জাহাজের আরোহীরা ভাবিলেন, উহা নদী; স্বচ্ছ নদীজলে তরুণ সূর্য্যের রশ্মি পতিত হওয়ায় স্থানগুলি উজ্জ্বল দেখাইতেছে। জাহাজ-খানি সেই সকল স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আরোহিগণ বুঝিলেন, যাহাকে তাঁহারা নদী মনে করিতেছিলেন তাহা আগ্নেয়পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত অত্যুষ্ণ দ্রব-ধাতু-প্রবাহ! ধাতুর সহিত যে গন্ধক মিশ্রিত ছিল, তাহার ধূমে শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। আর অগ্রসর

হওয়া গেল না। ক্রাকাতোয়া দ্বীপের অপর পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া নাবিকেরা জাহাজ চালনা করিতে লাগিল। এই দ্বীপে অতি প্রাচীনকালে একটি আগ্নেয়পর্ব্বত ছিল, কিন্তু গত এক শতাব্দীর মধ্যে তাহাতে অগ্নির চিহ্ন দেখা যায় নাই। এই কারণে নানা স্থান হইতে বহু লোক আসিয়া ক্রাকাতোয়াতে

ধূমোদ্গমন।

কৃষিকার্য্যাদি আরম্ভ করিয়াছিল। আরোহিগণ জাহাজ হইতে নামিয়া দেখিলেন, দ্বীপে যে সকল সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এবং

সুন্দর কৃষিক্ষেত্র ছিল, এখন তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রাম, পল্লী অরণ্য সকলই তথাকার অধিবাসিগণসহ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে! সমস্ত দ্বীপ অনুসন্ধান করিয়া একটিও জীবিত পশু বা পক্ষী দেখা গেল না।

ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাত তিন মাস ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিল। লোকে ভাবিল, আর কিছুকাল পরে উহার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। ১২ই আগষ্টের প্রাতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী দ্বীপ হইতে দেখা গেল, ক্রাকা-তোয়াতে আবার ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহা সাধারণ অগ্নি নয়,—সমুদ্রতল বিদীর্ণ করিয়া বন্ধনমুক্ত ভূগর্ভের অগ্নি গভীর জলরাশির ভিতর দিয়া উপরে উঠিতেছে। দেখা গেল, সমুদ্রের জল চারিপার্শ্বে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া রহিয়াছে! এই প্রলয়ানলকে নির্ব্বাপিত করিতে সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলরাশিও পরাভূত! ইহারই পরক্ষণে একটি ভয়ানক শব্দ শুনা গেল। তাহার পরে সকলই নীরব।

এই ঘটনার পরে জানা গেল, ক্রাকাতোয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপে আঞ্জের নামে যে নগরটি ছিল, তাহা ষাইট হাজার অধিবাসিসহ সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আরও একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সমুদ্রজলে একেবারে নিমজ্জিত হইয়াছে। ক্রাকাতোয়ার এই শেষ অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল ভস্মকণা

আকাশে উঠিয়াছিল, তাহা সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার আকাশকেও কয়েক সপ্তাহ আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল।

[দ্রষ্টব্য ঃ—প্রলয়ানল—সৃষ্টিনাশকারী অগ্নি। অগ্ন্যুৎপাত—আগুনের উৎপাত। নিষ্ক্রান্ত—বহির্গত। অত্যুষ্ণ—অতিশয় গরম।

২। ক্রাকাতোয়ার দুর্ঘটনার একটি বিবরণ শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদিগের দ্বারা লিখাইয়া লইবেন।]

পত্রলেখন।

পূর্ব্বে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না বলিয়া অধিকাংশ লোকই গ্রাম ত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাইত না। আর গেলেও একস্থান হইতে অন্যত্র সংবাদপ্রেরণ অত্যন্ত দুর্ঘট ছিল। অনেক সময়ে পত্রসহ লোক প্রেরণ করিতে হইত। এই সকল কারণে পূর্ব্বে অল্প লোকই চিঠিপত্র লিখিত। এখন প্রায় সকল লোককেই মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে হয়; সেইজন্য দিন দিন ডাকঘরের সংখ্যাও ডাকঘরে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

কিন্তু যদিও এখন লোকের চিঠিলেখার অভ্যাস বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি সকলে চিঠি লিখিবার প্রণালী জানে না।

অনেকে এইজন্য নিজেরা একটু আধটু লিখিতে সমর্থ হইলেও অন্য লোক দ্বারা আপনাদের পত্র লিখাইয়া লয়। এই পাঠে তোমাদিগকে পত্রলিখন-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

চিঠির চারিটা ভাগ আছে। শিরোনামা, আরম্ভ, মধ্য ও সমাপ্তি। প্রথমে শিরোনামের বিষয় বলা যাইতেছে।

যাঁহার নিকট পত্র লিখিতে হইবে, তিনি যদি পূজনীয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'পরম পূজনীয়', 'ভক্তিভাজন' এবং 'পূজ্যপাদ' ইত্যাদি লিখিতে হয়, তৎপরে তাঁহার নাম, ও সম্বন্ধ থাকিলে তাহা এবং স্ত্রীলোকের স্থলে, সময় সময় সম্বন্ধমাত্র উল্লেখ করিতে হয়। যথা—"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়" অথবা "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী পিতৃদেব" অথবা "পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী বা মাসীমাতা ঠাকুরাণী" ইত্যাদি তৎপরে "শ্রীচরণেষু—," "শ্রীচরণকমলেষু," "ভক্তিভাজনেষু" ইত্যাদি লিখিতে হয়।

যাহার নিকট চিঠি লিখিত হইতেছে তিনি যদি বন্ধু হন, তাহা হইলে 'পরম পূজনীয়' ইত্যাদির স্থলে 'সুহৃদ্বর,' 'বন্ধুবর,' 'আত্মীয়বর,' 'প্রীতিভাজন' ইত্যাদি এবং "শ্রীচরণেষুর" স্থলে 'সুহৃদ্বরেষু', 'বন্ধুবরেষু', 'করকমলেষু', ইত্যাদি লিখিতে হয়। আর স্নেহ বা আশীর্ব্বাদের পাত্রের নিকট চিঠি লিখিতে হইলে 'পরমকল্যাণবর', স্নেহাস্পদ', এবং 'কল্যাণবরেষু', 'স্নেহভাজনেষু' ইত্যাদি লিখিবার রীতি আছে। এইরূপে নাম লিখা হইলে

ঠিকানা, অর্থাৎ কাহার বাড়ী, কোন্ গ্রাম, পোষ্টাফিস কোথায়, ও জিলা কি ইত্যাদি ঠিকানায় স্পষ্ট করিয়া লিখা আবশ্যক।

মুসলমানগণ শিরোনামে 'পরম পূজনীয়' স্থলে 'আরজ দস্ত-বখেদমতে বন্দেগান আ'লসান' লিখেন, 'শ্রীচরণেষু' স্থলে 'মোবারক জনাবেষু' লিখেন।

শিরোনামে নামের পর যে পাঠ (অর্থাৎ শ্রীচরণেষু' ইত্যাদি) লিখা হইয়াছে তাহাই পত্রের অভ্যন্তরে আরম্ভ-ভাগে লিখিবে। মুসলমানেরা এখানে 'পূজনীয়' স্থলে 'মোবারক জনাবেষু' লিখেন অথবা "আদাব অন্তে আরজ এই" লিখেন। অনেকে ইদানীং উর্দ্দূ রীতি ত্যাগ করিয়া 'বন্ধুবরেষু,' 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' ইত্যাদিও লিখিয়া থকেন।

পত্রের মধ্যভাগে বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব সরল ও স্পষ্ট-ভাবে লিখা উচিত। ছলনা ও কৃত্রিমতা সর্ব্বত্রই দূষণীয়, পত্রের মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে। অনর্থক ও অনুচিত বাক্য কখনও প্রয়োগ করিতে নাই। ভাষা কথোপকথনের মত হওয়া সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয় নহে। আবার সকল স্থলে গুরুতর গাম্ভীর্য্যও শোভা পায় না। গুরুজনের নিকট বিনীত ও গম্ভীর, প্রিয়জনের নিকট প্রীতিপূর্ণ ও স্নিগ্ধ ভাষায় পদ প্রয়োগ করিবে। পত্রের শেষভাগে নিজের কুশল-জ্ঞাপন, এবং যাঁহার নিকট পত্র লিখা হইতেছে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবার রীতি আছে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রীতি।

পত্রের সমাপ্তিতে গুরুজনের নিকট 'প্রণত,' 'সেবক',

হন, তখন মনে হয়—যেন একটি প্রকাণ্ড অগ্নি-গোলক সমুদ্র-জল হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে।

তোমরা বোধ হয় ভাব, পৃথিবীর স্থলভাগে যত প্রাণী আছে জলভাগে তত নাই। কিন্তু তাহা নয়, সমুদ্রের তলও নানাজাতীয় জলচর প্রাণীতে পূর্ণ রহিয়াছে; স্থলচর প্রাণীদের ন্যায় তাহারা এক জাতি অপর জাতিকে হত্যা করিয়া জীবন ধারণ করে। তিমি মৎস্যের নাম তোমরা শুন নাই কি? ছোট জলচর প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্যই ইহারা সমুদ্রতলে সর্ব্বদা ছুটাছুটি করে। হাঙ্গর অতি ভয়ানক প্রাণী। স্থলচর প্রাণীদিগের মধ্যে সিংহ ও ব্যাঘ্র যেমন ভয়ানক, জলচর প্রাণীদিগের মধ্যে হাঙ্গর ঠিক সেই রকমই ভয়ানক। দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করাই ইহাদের কাজ। ইহা ছাড়া শঙ্খ ও শুক্তি-জাতীয় যে কত প্রাণী সমুদ্র-তলে বিচরণ করে তাহা গণনা করা যায় না।

প্রবাল কীটের নাম তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ। ইহারা সমুদ্রতলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহার পরে কোটি কোটি প্রবাল-কীটের মৃতদেহ একস্থানে সঞ্চিত হইয়া উচ্চ দ্বীপে পরিণত হয়। এই প্রকারে যে সকল দ্বীপের উৎপত্তি হয় তাহাদিগকে প্রবালদ্বীপ বলে।

পৃথিবীর স্থলভাগে অনেক পর্ব্বত, অনেক গুহা এবং উঁচুনীচু স্থান আছে। সমুদ্রতলেও অবিকল তাহাই দেখা যায়।

আমাদের বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ অনেক পর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রতলের তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশই অত্যন্ত নীচু; এই কারণে ইহার গভীরতাও অত্যন্ত অধিক।

সমুদ্রের জল অত্যন্ত লবণাক্ত, এই জন্য ইহা পান করা যায় না। সমুদ্রযাত্রার সময়ে পানীয় জল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। সমুদ্রজলে স্নান করিলে শরীর ভাল থাকে এই জন্য অনেকে কেবল স্নানের জন্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমুদ্রতীরে আসিয়া থাকেন।

সম্রাট্ এড্‌ওয়ার্ড ও বুড়ী।

আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পিতা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডকে লোকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ

সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড।

পুত্র ছিলেন। রাজা বলিয়া তাঁহার মনে একটুও অহঙ্কার ছিল না। কিসে প্রজারা শান্তিতে থাকিবে, তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। এড্‌ওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন, সেই সময়কার একটি ঘটনার কথা তোমাদিগকে বলিব।

যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড রাজবাড়ীর নিকটে প্রায়ই একাকী বেড়াইতেন। তখন তাঁহার পোষাকের কোন আড়ম্বর থাকিত না; কাজেই লোকে তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। একদিন প্রাতে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন। পথ নির্জ্জন; কেবল এক বুড়ী ঝুড়িতে কতকগুলি জিনিষ রাখিয়া পথের ধারে বসিয়া ছিল। বুড়ী বড় বিপদে পড়িয়াছিল; ঝুড়িটা যে তাহার মাথায় উঠাইয়া দেয়, এমন লোক নিকটে ছিল না। যুবরাজকে কাছে দেখিয়া সে কাতরভাবে বলিল,—"বাবা, যদি তুমি দয়া করিয়া ঝুড়িটি আমার মাথায় উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

যুবরাজ বুড়ীর মাথায় ঝুড়ি উঠাইয়া বলিলেন,—"তুমি কোথায় যাইতেছ?"

বুড়ী উত্তর করিল—"আমার বাড়ী গরু আছে। গরুর দুধের মাখন তৈয়ারি করিয়াছি। তাহাই বাজারে বেচিতে যাইতেছি।"

যুবরাজ বলিলেন,—"আমি মাখন খাইতে ভালবাসি। আমার নিকটে তুমি এই মাখন বিক্রয় করিবে কি?"

বুড়ী বলিল,—"হাঁ, নিশ্চয়ই বিক্রয় করিব। তুমি কত মূল্য দিবে?"

যুবরাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি যদি এই ঝুড়ির সমস্ত মাখন দাও, তাহা হইলে তোমাকে আমার মাতার দুইটি ছবি দিব।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

বুড়ী এই কথা শুনিয়া ভাবিল যুবক পরিহাস করিতেছেন। সে দুঃখিত হইয়া বলিল,—“গরিবের সহিত পরিহাস করা ভাল নয়। তোমার মায়ের ছবি লইয়া আমি কি করিব? আমি অর্থ চাই। এই মাখন বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইব, তাহা দিয়া আমাকে এক সপ্তাহের খরচ চালাইতে হইবে।”

যুবরাজ আবার হাসিয়া উত্তর করিলেন,—“আমার মায়ের দুইটি ছবিতে তোমার অনেক দিনের খরচ চলিয়া যাইবে।”

এই বলিয়া যুবরাজ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখের ছবিযুক্ত দুইটি মোহর বুড়ীর হাতে দিলেন। সে জীবনে কখনও মোহর হাতে পায় নাই। কয়েক সের মাখনের বদলে দুইটি মোহর পাইয়া সে অবাক্ হইয়া গেল।

যুবরাজ বুড়ীকে আবার বলিলেন,—“দেখ, পরিহাস করি নাই। মোহরে আমার মায়ের মুখের ছবি আঁকা আছে।”

এতক্ষণে বুড়ী যুবরাজকে চিনিতে পারিল এবং বার বার তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পরে যুবরাজ প্রায়ই বুড়ীর সংবাদ লইতেন। সে যতদিন বাঁচিয়া ছিল, ততদিন রাজবাড়ীতে মাখন জোগাইয়াছিল।

[দ্রষ্টব্য—এই পাঠে সম্রাট্ এড্ওয়ার্ডের জীবনের যে ঘটনাটি বিবৃত হইল, তাহা শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে দিয়া লিখাইয়া লইলে ভাল হয়।]

কলাগাছ।

কলাগাছ আমাদের পল্লীগ্রামের সকল বাগানেই আছে। ইহা আমাদের বড় উপকারী গাছ। তাই যাহাদের বাগান নাই, তাহারা বাড়ীর উঠানেও দুই এক ঝাড় কলাগাছ পুঁতিয়া রাখে। চাঁপা, মর্ত্তমান, কানাই বাঁশী প্রভৃতি গাছের পাকা কলা আমাদের পরম উপাদেয় খাদ্য। তোমরা নিশ্চয়ই কাঁচা কলার তরকারি খাইয়াছ। পাকিলে এই কলা সুস্বাদু হয় না, এইজন্য কাঁচাতেই তরকারি করিয়া খাওয়া হয়। কাঁচাকলা অতি পুষ্টিকর খাদ্য।

কলাগাছের সকল অংশই আমাদের উপকারে আইসে। মোচা অর্থাৎ কলার ফুল এবং থোড় আমরা তরকারি করিয়া খাই। বৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ডে কলার পাতা ভোজনপাত্র-রূপে ব্যবহার করা হয়। কলাগাছের খোলাও ফেলা যায় না। এগুলিকে শুকাইয়া পোড়াইলে যে ছাই পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক ক্ষার থাকে। লোকে এই ক্ষার দিয়া ময়লা কাপড় পরিষ্কার করে। কলার খোলায় যে আঁশ থাকে, তাহা সাধারণ সূতার মত শক্ত হয়। কলাগাছের সূতায় অনেক কাজ হয়।

ধান, যব, গম ইত্যাদি শস্যের চাষের জন্য কৃষকদের যে রকম পরিশ্রম করিতে হয়, কলাগাছের আবাদের জন্য সে রকম

পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া অন্য ফসলের আবাদের জন্য যেমন সময় মত বৃষ্টির দরকার হয়, ইহাতে তাহা হয় না। কলাগাছ বার মাসই ফলে। সেই জন্য যে কোন সময়ে বৃষ্টি হইলে কলাগাছের উপকার হয়।

পুষ্করিণীর সংস্কার করিবার সময়ে যে পাঁক মাটির তীরে জমা রাখা হয়, তাহাতে কলাগাছ ভাল জন্মে। আট হাত অন্তর কলাগাছ পুঁতিলে ফল ভাল হয়। গাছে নূতন পাতা গজাইলে সেগুলিকে যাহাতে গরুতে না খায় বা লোকে কাটিয়া না লয়, তাহা দেখা প্রয়োজন। পাতা কাটিলে গাছ দুর্ব্বল হয়।

কৃষকদের মুখে একটি সুন্দর কবিতা শুনা যায়। তাহারা বলে,—

“তিনশত ষাট্ ঝাড় কলা রুয়ে,
থাক্‌গে চাষা ঘরে শুয়ে।”

অর্থাৎ তিনশত ষাইট্ ঝাড় কলাগাছ পুঁতিলে যে কলা জন্মে তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষক সংসারের বার্ষিক সকল খরচই চালাইতে পারে।

বীজ পুঁতিয়া কেহ কলাগাছ উৎপন্ন করে না। মোচা ধরিবার সময়ে কলাগাছের গোড়া হইতে আপনিই অনেক নূতন ছোট গাছ কুঁড়ির মত বাহির হয়। এই সকল চারাগাছকে কলার “বোগ” বা “তেউড়” বলে। সেগুলিকে সাবধানে

উঠাইয়া দূরে পুঁতিয়া দিলে প্রত্যেকটিই ক্রমে নূতন ঝাড় হইয়া দাঁড়ায়।

[অনুশীলন ঃ—কলাগাছের কোন্ কোন্ অংশ আমাদের ব্যবহারে লাগে ?

২। যাহা হইতে বারমাসই ফল পাওয়া যায় সে প্রকার আর একটি গাছের নাম বল।]

দিল্লী।

সমগ্র ভারতবর্ষে দিল্লীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিখ্যাত নগরী। কথিত আছে, পাণ্ডবদিগের রাজধানী হস্তিনাপুর দিল্লীর নিকটেই অবস্থিত ছিল। তাহার পরে অনেক হিন্দু ও মুসলমান নৃপতি এখানেই রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ইংরেজ-রাজের রাজধানীও দিল্লীতে আছে। ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-সময়ে সেখানে যে বৃহৎ অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাও দিল্লীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা রাজ্যাভিষেকের যে বিবরণ পুরাণে পাঠ করি, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক প্রায় সেই প্রকার সমারোহেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

দিল্লী নগরীর চারিদিকে পাঁচক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের এত চিহ্ন রহিয়াছে যে, তাহা দেখিলে দর্শকমাত্রকেই অবাক্ হইতে হয়। সেখানে পুরাতন দুর্গ ও রাজভবনাদির যে সকল ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহার প্রত্যেক ইষ্টকে এবং প্রস্তরে অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য দেখা যায়।

মোগল সম্রাট্ সাহজাহানের "লালকিল্লা" নামক দুর্গটি দিল্লীর একটি দর্শনীয় বস্তু। "লাহোর গেট্" এবং "দিল্লী গেট্"

সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

নামক দুইটি বৃহৎ সিংহদ্বার এই দুর্গের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণে ভারতের সহস্র সহস্র বিখ্যাত শিল্পী দশ বৎসর ধরিয়া অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দিল্লীর প্রাসাদ আর একটি অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই প্রাসাদ লোহিতবর্ণের শিলা দিয়া নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রহরীদের থাকিবার জন্য প্রাচীরের উপরে মাঝে মাঝে এক একটি গম্বুজ আছে। সিংহদ্বার দিয়া
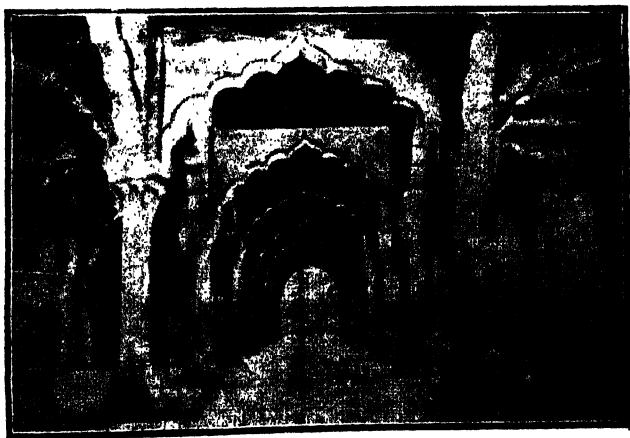
দেওয়ানি আম।

প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিলেই প্রথমে "নক্করখানা" অর্থাৎ সঙ্গীতাগার দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারই নিকটে ভুবনবিখ্যাত

দরবার-গৃহ "দেওয়ানি-আম" অবস্থিত। এই সৌধটি ভারতীয় শিল্পীদিগের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেওয়ানি-আমের দুইপার্শ্বে ও সম্মুখে দেওয়াল নাই। কয়েক শ্রেণী লোহিত-শিলানির্ম্মিত স্তম্ভ গৃহের ছাদ ধারণ করিয়া আছে। গৃহের মধ্যস্থলে সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি মঞ্চ অবস্থিত। ইহাতে যে সকল কারুকার্য্য আছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মনে

দেওয়ানি খাস।
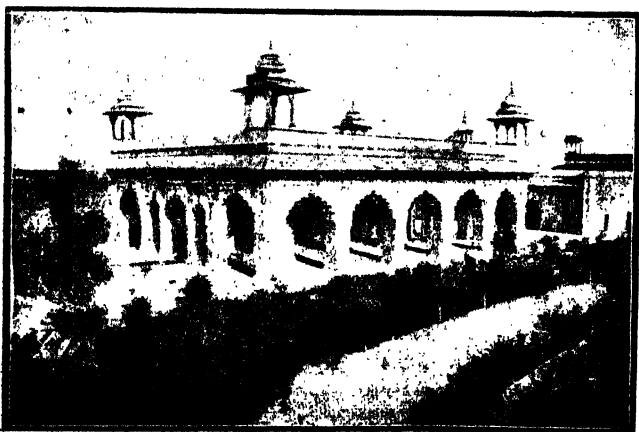
হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা একত্র হইয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয় রাখিবার জন্যই যেন মঞ্চটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহারই উপরে সাহজাহানের সেই জগদ্বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন

স্থাপিত ছিল। মঞ্চের চারিকোণে যে চারিটি মর্ম্মরস্তম্ভ আছে, তাহারই উপরে মোগল সম্রাটের মণিমুক্তা-খচিত চন্দ্রাতপ শোভা পাইত। মঞ্চের পশ্চাতের প্রাচীর ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে আজও অশেষ কারুকার্য্য বর্ত্তমান। ইহাতে বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত যে পশুপক্ষী ও লতাপাতার চিত্র আছে, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

স্নানাগার।

দেওয়ানি-আমের নিকটে দেওয়ানি-খাস দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা মোগল সম্রাট্‌দিগের আর একটি দরবার-গৃহ ছিল। ইহার সমস্তই অতি শুভ্র মর্ম্মরপ্রস্তর দিয়া নির্ম্মিত। দূর হইতে

দেখিলে ইহাকে একটি সুন্দর শিবির বলিয়া ভ্রম হয়। কারুকার্য্যে দেওয়ানি-খাস অন্যান্য প্রসিদ্ধ সৌধের তুলনায় কোন অংশে হীন নয়। কথিত আছে, ইহার ভিতরটার
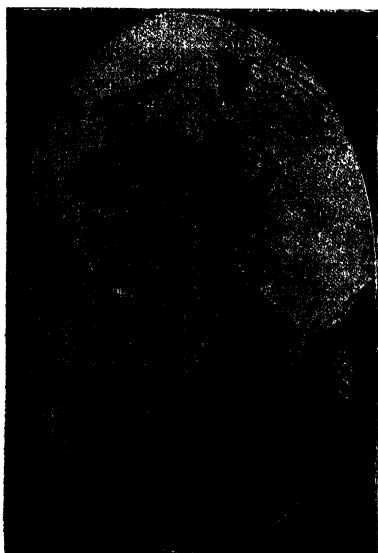
আরঙ্গজেব।

আগাগোড়া রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। মহারাষ্ট্র-দস্যুদিগের দ্বারা তাহা লুণ্ঠিত হইয়াছে। গৃহের ভিতরে পারসী ভাষায়

স্বর্ণাক্ষরে একটি সুন্দর কবিতা লিখিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে,—"হে মানবগণ! তোমরা এই পৃথিবীতে যদি স্বর্গ দেখিতে চাও, তবে এখানে আইস,—ইহাই স্বর্গ।" এই গৃহের অভ্যন্তরে সত্যই অমরাবতীর সুষমা বিদ্যমান।
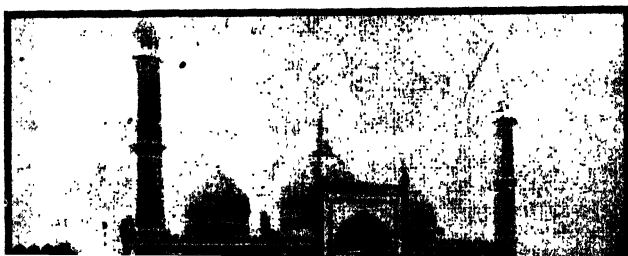
জুম্মা মস্‌জেদ্‌।

দিল্লীর প্রাসাদে "হামাম" অর্থাৎ স্নানাগার আর একটি দর্শনীয় বস্তু। শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত এই গৃহের প্রত্যেক শিলাখণ্ড অশেষ কারুকার্য্যময়। ইহার উপরকার তিনটি গুম্বজ আজও সুন্দর অবস্থায় আছে। গৃহের ভিতরে স্নানের জন্য বৃহৎ জলাধার এবং কৃত্রিম নির্ঝরাদি ছিল, তাহার চিহ্ন আজও দেখা যায়।

আরঙ্গ্‌জেব প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে "মতি-মস্‌জেদ" নামে ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা স্নানাগারের নিকটেই আছে। রাজমহিলাগণ উপাসনার জন্য এই মস্‌জেদে আসিতেন। ইহার প্রত্যেক প্রাচীর ও ছাদ বহু সুদৃশ্য লতাপাতাদির চিত্রে সুশোভিত। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে এই মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজও ইহার প্রাচীরের প্রত্যেকটি চিত্র অম্লান রহিয়াছে।

দিল্লী নগরীতে অন্য প্রাচীন মস্‌জেদ্ অনেক আছে। সোনা মস্‌জেদ্, ফতেপুর মস্‌জেদ্ প্রভৃতি সকলই প্রাচীন শিল্পীদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ-রূপে আজও দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু সেখানে "জুম্মা-মস্‌জেদ্" নামক প্রসিদ্ধ ভজনালয়ে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহার তুলনা নাই। প্রায় নব্বুই হস্ত উচ্চ এই মস্‌জেদের সমস্তই শ্বেত ও লোহিত প্রস্তরে গঠিত। ইহার তিনটী প্রবেশ দ্বার এবং ছাদে পনেরোটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেক গম্বুজ স্বর্ণে আচ্ছাদিত। প্রবেশদ্বারগুলি পিত্তল নির্ম্মিত। মস্‌জেদের প্রাচীরগাত্রে যে বিবরণী আরবী ভাষায় খোদিত আছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইহার নির্ম্মাণকার্য্য ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। কথিত আছে, পাঁচ হাজার সুদক্ষ শিল্পী ছয় বৎসর অবিরাম পরিশ্রম করিয়া এই মস্‌জেদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রসিদ্ধ সৌধাবলী ব্যতীত দিল্লী নগরী ও তাহার বাহিরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। সেগুলির বিবরণ

দিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। আমরা এখানে কেবল হুমায়ুনের সমাধিমন্দির এবং প্রসিদ্ধ কুতব মিনারের বিবরণ দিয়া এই পাঠ শেষ করিব।
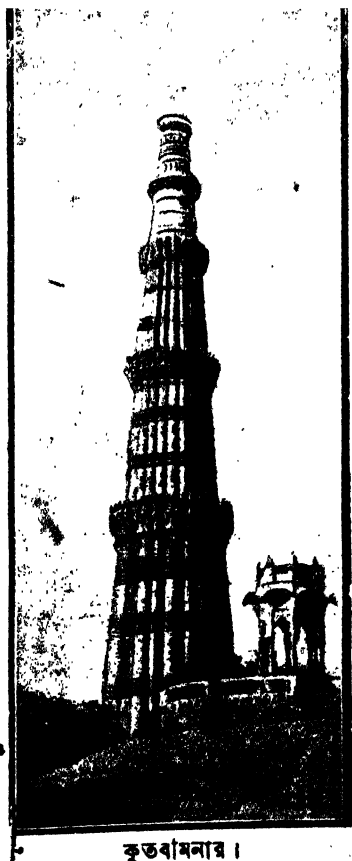
কুতবমিনার।

হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য পনের লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ষোল বৎসরে শেষ হয়। উচ্চ ভিত্তির উপরে এই মন্দির অবস্থিত। ভিতরের গৃহ অষ্টকোণাকৃতি এবং বিচিত্রবর্ণের শিলা দিয়া নির্ম্মিত। ছাদের উপরকার চূড়াগুলিও অষ্টকোণবিশিষ্ট। ইহা কতকটা তাজমহলের রকমে নির্ম্মিত। হুমায়ুনের শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত কবর ছাড়া ইহার ভিতরে হুমায়ুন-পত্নী হামিদাবানু বেগম-প্রভৃতি অনেকের কবর আছে।

প্রসিদ্ধ কুতবমিনার দিল্লী হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা একটি অত্যুচ্চ জয়স্তম্ভের আকারে নির্ম্মিত। কথিত আছে, কুতবুদ্দিন নামে কোন সাধুর নামানুসারে ইহার নাম কুতবমিনার রাখা হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, এই স্তম্ভ পৃথারাজ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার উপরে দাঁড়াইয়া যমুনা নদী দর্শন করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুতবমিনারের উচ্চতা প্রায় ১৬০ হস্ত। ইহা পাঁচতলে বিভক্ত। প্রত্যেক তলের চারিদিকে বারান্দা আছে। ৩৮০টি সোপানের ধাপ অতিক্রম না করিলে সর্ব্বোচ্চ তলে উপস্থিত হওয়া যায় না। কুতবমিনারের উপর হইতে দিল্লীর চারিদিকে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা অতি সুন্দর!

সবুক্তগীনের স্বপ্ন।

সবুক্তগীন আফগানিস্থানের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার কয়েক বার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল।

সবুক্তগীন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইলেও তাঁহার হৃদয় নানা গুণে মণ্ডিত ছিল। কথিত আছে, সমগ্র আফগানিস্থানের রাজপদ লাভ করিবার পূর্ব্বে সবুক্তগীন এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যজাতির নেতা ছিলেন। পর্ব্বতবিহারী জাতিসমূহ প্রায়ই অত্যন্ত দরিদ্র হয়, সবুক্তগীন দলপতি হইলেও এরূপ নিঃস্ব ছিলেন যে, তাঁহার একাধিক ঘোটক ছিল না। তিনি মৃগয়া দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন মৃগয়াকালে সবুক্তগীন একটি ক্ষুদ্র মৃগশিশু লাভ করেন। ঐ মৃগশিশুর মাতা তখন অদূরে নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করিতেছিল। অশ্বের পাদশব্দ কর্ণগোচর হইলে মৃগী ফিরিয়া দেখিল যে, তাহার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানটিকে একজন বীরপুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া দরিদ্র যেরূপ ভিক্ষার্থী হইয়া সকরুণনয়নে ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, সেইরূপ মৃগী সবুক্তগীনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মৃগীর এই অবস্থা দেখিয়া সবুক্তগীনের কোমল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইল। তিনি মৃগশিশুটিকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং সেও

এক দৌড়ে মাতার নিকটে উপস্থিত হইল। সন্তানকে পাইয়া মৃগী আনন্দিত হইল; বোধ হইল যেন, সে প্রাণ ভরিয়া সবুক্তগীনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সবুক্তগীনের মৃগয়া সে দিন নিষ্ফল হইলেও সেই মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিল।

সেই দিনই নিশীথকালে সবুক্তগীন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন এক শোভাময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন—সেখানে কেবল আনন্দ;—দুঃখের লেশমাত্র নাই। উজ্জ্বলাবয়ব পরীগণ তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের গাত্রের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে পরীগণ তাঁহাকে এক মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত করিল; সবুক্তগীন শুনিলেন, সেই মহাপুরুষ স্বয়ং হজরত মহম্মদ। পয়গম্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সবুক্তগীন, তুমি আজ মৃগীর প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে জগতের অধীশ্বর খোদাতালা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার দরবারে তোমার নাম পৃথিবীর প্রধানতম রাজগণের নামের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তুমি মহাপ্রতাপশালী রাজা হইবে। অদ্য তুমি মৃগী ও মৃগশিশুর প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছ, রাজপদ লাভ করিয়া প্রজাগণের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিও। তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গেও রাজসুখে বঞ্চিত করিবেন না।" সবুক্তগীনের এই স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

সাহিত্যসোপান।

চতুর্থ ভাগ।

(পদ্যাংশ)

ঈশ্বর-বন্দনা।

এ ভব-ভবন মাঝে
যেদিকে যখন চাই,
তোমার করুণারাশি
কেবলি দেখিতে পাই।

তোমার আদেশে রবি
উজ্জল কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ভরিয়া রয়।

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা তা'য়
উছলি উছলি হাসে।

আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা-ধারা
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা।

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না সুধাতে বলে সদা
তোমারি স্নেহের কথা।

কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই,
যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই।

কি আর চাহিব নাথ
তোমার চরণ-তলে,
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে ?

এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বৃক্ষ-শ্রেণী

এই যে বিটপি-শ্রেণী হেরি সারি সারি,
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি।
যখন মানবকুল ধনবান্ হয়,
তখন তা'দের শির সমুন্নত রয় ;
কিন্তু ফলশালী হ'লে এই তরুগণ
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচপ্রায় কারো ঠাঁই নহে অবনত।
কঠিন অপ্রিয় ভাষ করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজ-লোচন ;
ইহাদের শির'পরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্রবদনে।

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বিদ্যা।

জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন
চোরে না লইতে পারে করিয়া হরণ
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন।
এর তরে লোকে বলে বিদ্যা মহাধন।
বিদ্যা করে মানুষের মূর্খতা ভঞ্জন।
বিদ্যা করে মানুষের হৃদয় রঞ্জন ॥
বিদ্যা করে মানুষের বিপদ উদ্ধার।
বিদ্যা করে মানুষের সুখ্যাতি বিস্তার ॥
বিদ্যা করে মানুষে সুশীল ধনবান্।
বিদ্যাবলে মানুষের বাড়ে গুণ-জ্ঞান ॥
পৃথিবীতে কোন কার্য্য না দেখি এমন।
বিদ্যাবলে নাহি পারে করিতে সাধন ॥
তাই বলি লভিবারে বিদ্যা মহাধন।
কর প্রাণপণ সবে কর প্রাণপণ ॥

৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র

বড় কে ?

আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় !
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে যে বড় হয় বড় গুণ তার।
হিতাহিত না জানিয়া মরে অহঙ্কারে,
নিজে বড় হ'তে চায়—ছোট বলি তারে।
গুণেতে হইলে বড়, বড় ক'বে সবে,
যদি বড় হ'তে চাও ছোট হও তবে।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দশরথের উপদেশ।

পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসন'পরে।
পাত্র মিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা-বিদ্যমান!
রাজনীতি, ধর্ম্ম, আর বিবিধ বিধান॥
"প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন॥
লোকের রঞ্জন তুমি করিহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে॥
রাজনীতি, ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা, যশঃ বাড়ে দিনে দিনে॥
পরহিংসা, পরপীড়া করিহ মনে।
কভু না করিহ, রাম, লোভ পরধনে॥

শরণ লইলে শত্রু ক'রো পরিত্রাণ।
দম্ভে যেন স্ফীত কভু নাহি হয় প্রাণ॥
দরিদ্রের ভরণ করিও চিরদিন।
আদর করিও তারে জ্ঞানে যে প্রবীণ॥
আচার, বিনয়, বিদ্যা, ধর্ম্মবল আর।
আছে যার, নমে তারে সকল সংসার॥
অবিনয়ী, অবিবেকী, ধনী যদি হয়।
দীন হতে হীন সে যে নাহিক সংশয়॥"

কৃত্তিবাস।

একে একে।

এক পা দুই পা করি ধীরে ধীরে অগ্রসরি,
করে নর অতি উচ্চ গিরি উল্লঙ্ঘন ;
একটি একটি রেখা পাশে পাশে দিলে দেখা,
কি বিচিত্র চিত্রপট হয় বিরচন।
ইষ্টক ইষ্টকোপরি যদি সুসজ্জিত করি,
হয় তাহে সুবিশাল প্রাসাদ রচিত ;
একে একে স্তরে স্তরে রাখি শিলা শিলা' পরে
অভ্রভেদী হিমাচল হয়েছে গঠিত।
সীমাশূন্য, মহাকায় বিপুল এ বসুধায়,
রেখেছে যে জলনিধি করিয়া বেষ্টন,
লয়ে বারি বিন্দু বিন্দু রচিত সে মহাসিন্ধু,
কণা কণা বালুকায় সাহারা সৃজন।
অগাধ জলধি-গর্ভে প্রবাল কীটাণু সর্ব্বে
একে একে নিজ দেহ করিয়া স্থাপিত,
গড়ে নব নব দেশ অপূর্ব্ব সুন্দর বেশ,
পর্ব্বত প্রান্তর বনে কিবা সুশোভিত।
বিশাল বিচিত্র যাহা জগতে দেখিছ, তাহা
হয় নাই একদিনে কখন সৃজন,

কত বর্ষ, যুগ কত নীরবে হ'য়েছে গত
তবে তাহা আজ তুমি দেখিছ এমন!
এই কথা স্মরি নর! হও ধীরে অগ্রসর,
কার্য্যের গুরুতা দেখি হারায়ো না বল;
বিশ্বাস রাখিয়া মনে যত্ন কর প্রাণপণে,
দীর্ঘশ্বাসে অশ্রুধারে ফলিবে না ফল।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু।

গোচারণের মাঠ

রাখাল গো-পাল লয়ে গোচারণে যায়,
হাতেতে পাঁচন-বাড়ি, টোকাটি মাথায়;
মাল-কোঁচা কটি-তটে, কোঁচরেতে চা'ল,
"ধেই ধেই" করি গরু করিছে সামাল।

শামলী ধবলী রাঙী কেমন দেখায়,
খুঁটি খুঁটি ঘাস খায়, গুটি গুটি যায়;
এক পা দুই পা যায় মাছি লাগে গায়,
শিঙ্ ঝাড়ে মাথা নাড়ে, লাঙ্গুল দোলায়।

বার বার আপনার শরীর কাঁপায়,
বসিতে না পারে মাছি উড়িয়া বেড়ায়।
ডাইনে বামেতে ফিরে, সোজা নাহি চলে,
নূতন নূতন ঘাস খায় দুই কলে।

কুটি-কাটি নাহি মাঠে, অতি নিরমল,
নীহারে ভিজান তৃণ সুচারু শ্যামল;
কাঁথার মতন পুরু, কেমন কোমল,
তূলার তোষকে যেন ঢাকা মখমল!

তরুণ তপন আভা খেলে তদুপরি,
চক্ চক্ করে মাঠ যেদিকে নেহারি।
দেখিতে দেখিতে রবি গগনে উঠিল,
দেখিতে দেখিতে মাঠ ঝকিতে লাগিল।

তরুরে তাড়না করি' বায়ু যায় চলি,
শাখীর কোলেতে পাখী করিল কাকলী।
সরোবরে তর তর করে নীল জল,
কাঁপিল কমল-পাতা, কলমীর দল।

পুকুরের পার ছাড়ি চলিল গো-পাল,
বটতলা পিছে ফেলি ধরিল জাঙাল।
রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বট-তরু ঘিরে,
গোচারণ-মাঠে গাভী চরে ধীরে ধীরে।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পরোপকার।

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল;
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান;
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজস্বরে অপরে মোহিত;
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে।

৺রজনীকান্ত সেন

প্রভাত।

রাত পোহাল, ফরসা হ'ল
ফুট্‌ল কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা,
জুট্‌ল অলিকুল॥

পূর্ব্বভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌ল দিবাকর।
সোণার বরণ তরুণ তপন
দেখ্‌তে মনোহর॥

ঘরের চালে পালে পালে
ডাক্‌ছে কত কাক।
পূজ-বাটীতে জোড়-কাঠিতে
বাজ্‌ছে যেন ঢাক॥

কত কুমারী সারি সারি
দুল্‌ছে কাণে দুল।
কানন হ'তে কচুর পাতে
আন্‌ছে তুলে ফুল॥

পান্তা খেয়ে শান্ত হ'য়ে
কাপড় দিয়ে গায়।
গরু চরাতে পাচন হাতে
রাখাল গেয়ে যায়॥

ভাড়ি বগলে ছেলের দলে
পাঠশালাতে যায়।
পথে যেতে কোঁচড় হ'তে
খাবার নিয়ে খায়॥

এই বেলা সকাল বেলা
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে আনন্দেতে
থাক্‌বে যাদুধন॥

৺দীনবন্ধু মিত্র।

মনোবল।

জিজ্ঞাসিলা পরীগণ ঈশ্বরের কাছে,—
"শিলা হতে দৃঢ়, প্রভু, অন্য কিছু আছে ?"
শুনিয়া কহেন আল্লা—"শুন, পরীগণ,
লৌহ দিয়া সবে করে শিলা বিদারণ ;
শিলা হতে লৌহ দৃঢ় তাই সবে কয়।"
পুনঃ কহে পরীগণ করিয়া বিনয়,—
"তব সৃষ্টি-মাঝে, দেব, হেন কিছু আছে—
লৌহের দৃঢ়তা অতি তুচ্ছ যার কাছে ?"
ঈশ্বর কহেন—"লৌহ তাপ দিলে গলে,
লৌহ হ'তে অগ্নি বড় তাই সবে বলে।"
পরীগণ কহে,—"প্রভু, কহ পুনরায়,
অগ্নি হ'তে, বড় কিবা গুণগরিমায় ?"
"সলিলের তেজে তেজে খর্ব্ব অগ্নির বিক্রম,"—
কহিলেন বিশ্বনাথ বিশ্বের নিয়ম।
পুনঃ কহে পরীগণ,,"কহ, সারাৎসার,
জল হ'তে বলীয়ান্ আছে কিছু আর ?"
"বারিধি চঞ্চল দেখ হয় বায়ুবলে,
নিজ গণ্ডি ছাড়ি ছুটি অন্য দিকে চলে ;

জল হ'তে বায়ু বলী"—ক'ন নিরঞ্জন।
"বায়ু কি বলীর শ্রেষ্ঠ ?" কহে পরীগণ।
হাসিয়া কহেন আল্লা,—"সত্য কহি সার,
মনোবল হ'তে শ্রেষ্ঠ বল নাহি আর।
সেই বলী যে ক'রেছে অভিমানে জয়,
অস্ত্র যার—দয়া, ক্ষমা, ধীরতা, বিনয় ;
ডা'ন হাতে দান করে, বাম নাহি জানে
তার সম বলী নাহি কেহ ত্রিভুবনে।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত।

তিনটি সদ্ভাব।

(১)

যেরূপ করিবে কাজ কার্য্যেতে দেখাও,
বৃথা গর্ব্বে কেন তাহা কহিয়া বেড়াও ?
না পার করিতে যদি কর যাহা গান,
কোথায় পাইবে লজ্জা রাখিবার স্থান ?

(২)

ইচ্ছা হয় রাজবস্ত্র পরিধান কর,
কিম্বা শার্দ্দূলের চর্ম্মে ঢাক কলেবর,
ইচ্ছা হয় পর অঙ্গে বিভূতিভূষণ,
কিংবা কর সর্ব্বদেহে চন্দন লেপন।
কিন্তু ভ্রাতঃ! এই কথা মনে যেন রয়,
ভিতরে সাধুতা, বাহ্যবেশে কিছু নয়।
দমনিতে যে পারে দুর্জ্জয় রিপুদল,
সেই সাধু, তুচ্ছ কথা বেশের বদল।

(৩)

এই তুচ্ছ অন্ন বস্ত্রে তুষ্ট রহ মন,
কারো কাছে কোন কিছু মেগ না কখন।
আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্যমূল্য নয়।
যদ্যপি বল্কল পর, রহ উপবাসী,
হ'ও না হ'ও না তবু পরের প্রত্যাশী।
চাওয়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে,
না খেয়ে পরাণে মরা ভাল তার চেয়ে।

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

স্পর্শমণি।

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে,
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা হ'তে আগমন
কি নাম ঠাকুর ?"
বিপ্র কহে, "কিবা কব পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্দ্ধমানে,
এত বড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মত
নাই কোনখানে।
জমা জমি আছে কিছু ক'রে আছি মাথা নীচু,
অল্প স্বল্প পাই।
ক্রিয়া কর্ম্ম যজ্ঞ যাগে, বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি, শিব কাছে বর মাগি,
করি আরাধনা ;

একদিন নিশিভোরে, স্বপ্নে দেব কন মোরে
"পূরিবে প্রার্থনা ;
যাও যমুনার তীর সনাতন গোস্বামীর
ধর দুটি পায়।
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি কাছে আছে জেনো
ধনের উপায়।"

শুনি কথা সনাতন, ভাবিয়া আকুল হন,
"কি আছে আমার ?
যাহা ছিল সে সকলি, ফেলিয়া এসেছি চলি
ভিক্ষামাত্র সার।"

সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,—
"ঠিক্ বটে ঠিক্ !
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক।

যদি কভু লাগে দানে,— সেই ভেবে ওই খানে
পুঁতেছি বালুতে।
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হোক দূর,
ছুঁতে নাহি ছুঁতে !"

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি, খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি
লোহার মাদুলি দুটি, সোণা হ'য়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে,
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কাণে কাণে
কহে কত কি যে।
নদীপারে রক্তচ্ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচল,
তখন ব্রাহ্মণ উঠে, সাধুর চরণ লুঠে,
ঝরে অশ্রুজল।
"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি
তাহার খানিক
মাগি আমি নত শিরে ;"— এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক্।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশিষ্ট

ব্যাকরণ

পদ-পরিচয়

এই শ্রেণীতে বালকগণ ব্যাকরণের পদ-পরিচয় শিক্ষা করিবে। ব্যাকরণ-গ্রন্থ শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং ব্যবহার করিবেন, ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত। শিক্ষক মহাশয় প্রতিদিনের পাঠ হইতে ছাত্রকে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া ইত্যাদি নির্ণয় করিতে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যার্থ নিম্নে এবিষয়ে কতকগুলি ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইল। এই ইঙ্গিতক্রমে তিনি পাঠের মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ বালকদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

(১) যাহা জাতি, নাম, গুণ, দ্রব্য বা ক্রিয়ার নাম প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষ্য বলে।

জাতি—মানুষ, গো, অশ্ব ইত্যাদি।

নাম—হরি, যদু, কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি।

গুণ—সৌন্দর্য্য, করুণা, বিনয়, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি।

দ্রব্য—কাষ্ঠ, পুস্তক, প্রস্তর, জল ইত্যাদি।

ক্রিয়া—গমন, ভ্রমণ, দর্শন, ভোজন ইত্যাদি।

(২) যাহা অন্য পদকে বিশেষ করে, অর্থাৎ তাহা কেমন বলিয়া দেয়, তাহাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের, অথবা অন্য বিশেষণের, অথবা ক্রিয়ার ধর্ম্ম, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

বিশেষ্যের বিশেষণ :—উজ্জ্বল চিত্র, বিশাল আকাশ, তরুণ বৃক্ষ।

বিশেষণের বিশেষণ :—পরম সুন্দর, ঈষৎ বক্র।

ক্রিয়ার বিশেষণ—ধীরে ধীরে যাইতেছে, দ্রুতবেগে দৌড়িতেছে ; সত্বর যাইতেছে।

(৩) যে শব্দ বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে বসে, তাহাকে সর্ব্বনাম বলা যায়। সর্ব্বনাম প্রয়োগ দ্বারা নামের পুনঃ পুনঃ উক্তি পরিহার করা যায়।

যিনি, যে, তিনি, সে, উনি, ও, ইনি, এ, তুমি, আমি, কে ইত্যাদি সর্ব্বনাম।

হরি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল যে, তাহার পিতা পীড়িত।

(৪) এবং, আর, ও, কি, কিন্তু, কেন, হে, ওহে, কেননা, বরং, ইদানীং, সম্প্রতি, হায়, আহা, না ইত্যাদি শব্দকে অব্যয় বলে। এই শব্দগুলি কোনও অবস্থায়ই স্বীয় রূপ পরিবর্ত্তন করে না বলিয়া এগুলিকে অব্যয় বলা হয়।

(৫) হওয়া, যাওয়া, করা প্রভৃতিকে ক্রিয়া কহে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ক্রিয়ার নামমাত্র বুঝায়, আর ক্রিয়াপদ কার্য্য হওয়া বা করাকে বুঝায়। 'যাইতেছে' ক্রিয়াপদ ; 'গমন' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয় তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া কহে ; যে ক্রিয়াতে তাহা হয় না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে।

'আমি ভাবিয়া দেখিলাম' এই বাক্যে ভাবিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া, দেখিলাম সমাপিকা ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহাকে সকর্ম্মক ক্রিয়া কহে ; যাহার কর্ম্ম নাই তাহা অকর্ম্মক ক্রিয়া—বৃষ্টি হইতেছে (অকর্ম্মক) ; হরি পুস্তক পড়িতেছে (সকর্ম্মক ; পুস্তক কর্ম্ম)।

কোনও কোনও ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। 'সে আমাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।'

পাঠানুশীলন।

প্রত্যেক পাঠের অন্তেই ঐ পাঠ-সম্বন্ধে যতগুলি প্রশ্ন হইতে পারে তাহা শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিবেন। ছাত্রগণ যাহাতে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর নিজ-ভাষায় দেয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মুখস্থ করা বিদ্যার প্রতি প্রথম হইতে অনাদর প্রদর্শন করিলে, ছাত্রগণ প্রতিদিনের পাঠের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে উৎসাহ বোধ করিবে।

এই পুস্তকে প্রত্যেক পাঠের অন্তে ঐ পাঠ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য দুই চারিটী প্রশ্ন শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐগুলি ভিন্ন আরও নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ছাত্রগণের বোধশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষকমহাশয় যতগুলি সম্ভব প্রশ্ন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

রচনা

বালকগণ তৃতীয় শ্রেণীতেই সরল বাক্য-রচনা অভ্যাস করিবে। যে বাক্যে একটিমাত্র কর্ত্তা ও একটি মাত্র ক্রিয়াপদ, তাহাকে সরল বাক্য কহে। যে বাক্যে একাধিক সরল বাক্য থাকে তাহাকে মিশ্রবাক্য কহে। কতকগুলি মিশ্র বাক্যের সমষ্টিতে 'প্যারাগ্র্যাফ্' হয়। মিশ্রবাক্য ও প্যারাগ্রাফ্ রচনা চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষণীয়।

মিশ্র বাক্যে সাধারণতঃ একটি প্রধান বাক্য এবং একাধিক আনুষঙ্গিক বাক্য থাকে।

'ভিক্ষুকের মান নাই' ইহা একটি সরল বাক্য। 'যে ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহার মান নাই' ইহা একটি মিশ্র বাক্য। উহাকে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, যথা 'যে ভিক্ষা করিয়া খায় সে যদি কোথাও যায়, তবে তথায় কেহ তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না' ইত্যাদি।

প্রথম মিশ্র বাক্যটিতে 'তাহার মান নাই' এইটি প্রধান বাক্য, 'যে ভিক্ষা করিয়া খায়' এইটি আনুষঙ্গিক বাক্য।

দ্বিতীয় মিশ্র বাক্যটিতে 'কেহ তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না,' এইটি প্রধান বাক্য, অপর দুইটি আনুষঙ্গিক বাক্য।

আনুষঙ্গিক বাক্যের পূর্ব্বে অর্থবিশেষে কখনও কখনও 'যেহেতু,' 'কেননা' ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,

'যদি প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠ, তবে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইবে।' 'রামকে কেহ সম্মান করে না, কেননা সে চুরি করে।'

দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ সরল বাক্য 'এবং,' 'ও,' 'কিন্তু,' 'নতুবা, প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা মিলিত করা হইলে যে বাক্য হয়, তাহাকে মিশ্র বাক্য না বলিয়া যুক্ত বাক্য বলা যাইতে পারে। যথা, রামের পিতা কৃষিকর্ম্ম করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেজারতি করেন'; 'রাম অদ্য বিদ্যালয়ে যায় নাই, কিন্তু সে রীতিমত স্নানাহার করিয়াছে' ইত্যাদি।

∴ যুক্ত বাক্যকে মিশ্র বাক্যে এবং মিশ্র বাক্যকে যুক্ত বাক্যে এবং উভয়কে সরল বাক্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

যুক্ত বাক্য—সে বিদ্বান্ কিন্তু তাহার ধর্ম্মবোধ নাই।

মিশ্রবাক্য—যদিও সে বিদ্বান্, তথাপি তাহার ধর্ম্মবোধ নাই।

সরল বাক্য—বিদ্যাসত্ত্বেও তাহার ধর্ম্মবোধ নাই।

বিশেষণ, বিশেষণ স্থানীয় পদসমষ্টি ও বিশেষণস্থানীয় বাক্য ইত্যাদি দ্বারা বাক্য-সম্প্রসারণ করা যায়। যথা,

(১) 'হরি পুস্তক পাঠ করিতেছে।'

(২) 'মেধাবী হরি পুস্তক পাঠ করিতেছে।'

(৩) 'আমাদের বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র হরি পুস্তক পাঠ করিতেছে।'

(৪) 'আমাদের বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র হরি মনোযোগ-সহকারে পাঠ্য পুস্তক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছে।' ইত্যাদি

(৫) 'হরি অতি মনোযোগী ছাত্র, সেইজন্য সে পুস্তক পাঠ করিতেছে।

'হরি যাহা পাঠ করিতেছে উহা একখানি পুস্তক।' ...ইত্যাদি

এক প্রসঙ্গের কতকগুলি বাক্য মিলিত হইয়া প্যারাগ্রাফ্ হয়। কোনও বিষয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হইলে ঐ বিষয়ের নানা দিক্‌ই আলোচনা করিতে হয়। কোনও একটি বিশেষ দিক্ সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহা এক প্যারাগ্রাফের অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত।

মিশ্রবাক্য, যুক্তবাক্য ইত্যাদি রচনার ন্যায় প্যারাগ্রাফ্ রচনার কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। এক প্রসঙ্গের কতকগুলি বাক্য অন্য প্রসঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রভাবে সাজাইলেই প্যারাগ্রাফ্ হয়।

———